আহলে সুন্নাত
ওয়াল জামায়াতের

আকিদা

ইমাম তাহাবী (রঃ)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের

আকীদা

- মূল আরবী -

ইমাম তাহাবী রঃ

জন্মঃ ২২৯ হিঃ মৃত্যুঃ ৩২১ হিঃ

অনুবাদ ও টীকা

অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন

মূলের অনুবাদ সম্পাদনা

অধ্যাপক ডঃ আহমাদ আল-বান্নানী

মক্কা মুকাররমা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের

আকীদা

ইমাম তাহাবী রঃ

প্রথম প্রকাশ
রজব ১৪১৭ হিজরী
অগ্রহায়ণ ১৪০৩ বাংলা
ডিসেম্বর ১৯৯৬ ইংরেজী

প্রকাশক
চেয়ারম্যান
ইসলাম প্রচার সমিতি
কেন্দ্রীয় মসজিদ কাটাবন
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

প্রচ্ছদ
গোলাম মোহাম্মদ

কম্পিউটার কম্পোজ
মজুমদার কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
২৪৬, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০

দাম
ত্রিশ টাকা মাত্র

সূচী

আরম্ভ

আলহামদুলিল্লাহ। অনেক বছর অনুসন্ধানের পর অবশেষে 'আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের' আকীদার কিতাব 'আল-আকীদাতুত্ তাহাবীয়া' হাতে পেলাম। এগার শ' বছর পূর্বে এটি লিখিত। মূল অংশসহ এ কিতাবের ব্যাখ্যা ও টীকা লিখেছেন অনেক বিশ্ব বরেণ্য আলেম। এদের মধ্যে আরব জগতের প্রখ্যাত আলেম্ ইমাম আলী ইবনে আবিল ইয্য আদ দামেশকী আল হানাফী (রঃ) (জন্ম .... মৃত্যু ....), ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসার সাবেক মুহতামিম বিশ্ব বিখ্যাত আলেম মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব (রঃ), ইসলামী দুনিয়ার বরেণ্য আলেম সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ধর্মীয় সংসদ "ইসলামী গবেষণা, ফাত্ওয়া, দাওয়াত ও ইরশাদ"-এর প্রধান আল্লামা শায়খ আবদুল আজীজ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে বায এবং এযুগের সেরা মুহাদ্দিস মুহাম্মদ নাসেরুদ্দিন আলবানী অন্যতম। এরা সবাই ইমাম তাহাবী (রঃ)-এর কিতাবে উল্লেখিত আকীদা গুলোকে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা বলে স্বীকার করেছেন এবং হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী, আহলে হাদীস এবং এসব মাযহাবের অনুসারী আলেমগণ একথায় একমত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শত শত বছর ব্যাপী তাঁরা সবাই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে আসছেন।

মূলত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি উম্মাত গড়েছিলেন। রাসূল (সাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে গোটা মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব একই ব্যক্তির হাতে নিবদ্ধ ছিল। ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা নয়। একারণে ধর্ম ও রাজনীতির বিভক্তি সেযুগে কল্পনাতীত ছিল। তাই উম্মাহ এক নেতা, এক নীতি, এক দীন, এক আদর্শ, এক দেশ এবং এক জামায়াতের অনুসারী ছিল। কিন্তু খেলাফতে রাশেদার পতনের পর আস্তে আস্তে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। এবং উম্মাহর রাষ্ট্রীয় ও দীনী নেতৃত্বে বিভক্তি আসে, দুটো আলাদা হয়ে যায়। এসব মতবিরোধ দূর করার ক্ষমতা ও নির্ভরযোগ্যতা তখন রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ছিলনা। এ মতবিরোধ বিভিন্ন মতবাদের জন্ম দেয়। প্রথমত এসব ছিল নিছক রাজনৈতিক মতবাদ। পরে এসব মতবাদের সমর্থক দলগুলো তাদের মতবাদকে ধর্মীয় ভিত্তির উপর দাঁড় করায়। ধীরে ধীরে এসব দল ধর্মীয় ফেরকায় রূপান্তরিত হয়। এদের অনেকে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের পৃষ্ঠপোষকতাও পায়। সূচনাকালে এসব ফেরকা অনেক খুন-খারাবীতে লিপ্ত হয়। উমাইয়া ও আব্বাসী খিলাফত আমলে এসব ফেরকার পারস্পরিক বিরোধ ও বিতর্ক চরমে পৌঁছে যায়। তা মুসলমানদের জামায়াতী ঐক্য বিনষ্ট

করে। প্রতিটি বিতর্কের বিষয় নতুন নতুন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও দার্শনিক সমস্যার জন্ম দেয়। প্রতিটি সমস্যা ও মতবাদ এক-একটি ফেরকার সৃষ্টি করে। এসব ফেরকা থেকে অসংখ্য ছোট ছোট উপফেরকার সৃষ্টি হয়। এ ফেরকাগুলোর মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ, কলহ-বিবাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার উদ্ভব হয়। এসব অসংখ্য ফেরকার মূলে ছিল ৪টি বড় ফেরকা- শিয়া, খারেজী, মুরজিয়া ও মুতাযিলা। কুরআন-হাদীসের প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে সেকালের আলেমগণ এসব ভ্রান্ত মতবাদের যুক্তি খণ্ডন করেন। ফলে এসব ভ্রান্ত ফেরকার অধিকাংশের বিলুপ্তি ঘটে। দুনিয়ায় কিতাবের পাতায় ছাড়া তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু উম্মাতের বৃহত্তম অংশ রাসূল (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদার মূলনীতি ও আদর্শের ওপর কায়েম থাকে। ধর্মীয় নেতৃত্বের অনুসরণে আজো এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। উম্মাহর এই ধারারই নাম 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।' ধর্মীয় নেতৃত্বের মধ্যে সর্বপ্রথম ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-ই এসব ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে স্বীয় মত ব্যক্ত করেন এবং স্পষ্ট ভাবে আল-ফিকহুল আকবারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এসব আকীদা, মত ও পথ তুলে ধরা হয়। তাঁর এই মতামত এবং তাঁর দু'জন প্রখ্যাত ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী (রহঃ) বর্ণিত আকায়েদের ভিত্তিতে ইমাম তাহাবী (রহঃ) (জন্ম- ২৩৯ মৃত্যু ৩২১-হিঃ, মুতাবিক ৮৫৩-৯৩৩ খৃঃ) 'আকিদায়ে তাহাবীয়া' রচনা করেন। এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকায়েদের একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব। সংক্ষিপ্ত হলেও ব্যাপক অর্থবোধক ও আকীদার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পথ নির্দেশক। বর্তমানে বিশ্বে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনেক ভ্রান্ত মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- ধর্মনিরপেক্ষতা, বুদ্ধিবাদ, ইহুদীবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ, কাদিয়ানী মতবাদ, সমাজবাদ, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র প্রভৃতি। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকায়েদ এবং এসব ভ্রান্ত মতবাদের উৎপত্তি, ভিত্তি, সংজ্ঞা, তাৎপর্য, বিশ্বাস ও মৌলিক ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই আজ আমরা দিশেহারা। যখন যে মতবাদ ইচ্ছা গ্রহণ-বর্জন করছি। এবং এরপরও নিজেকে খাঁটি সুন্নী মুসলমান বলে ভাবছি। নিজেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করছি। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বিবাদ তো এদেশের নিত্যদিনের ঘটনা। সুন্নী আকীদা সম্পর্কে অজ্ঞতাই এ জন্য দায়ী। তাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা গুলোর গুরুত্ব আজ অপরিসীম এবং ঈমান ও আকীদা ঠিক রাখার জন্য এগুলো জানা অপরিহার্য। এ অপরিহার্যতার তীব্র অনুভূতির বহিঃপ্রকাশই হল এ কিতাবের অনুবাদ ও প্রকাশনা।

ইমাম তাহাবী রঃ

ইমাম তাহাবী (রঃ) এর পুরো নাম আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালাম আল-আযদী-আত্-তাহাবী। তিনি ইমাম, হাফেজ, ফকীহ্, মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ ছিলেন। সংক্ষেপে ইমাম তাহাবী (রঃ) নামে পরিচিত ছিলেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর (রঃ) ও আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর মতে ইমাম তাহাবী (রাঃ) ২২৯ হিজরী সনে মিসরের 'তাহা' নামক পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩২১ হিজরীতে ৯২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মিসরে তিনি তাঁর মামা ইসমাইল ইবনে ইয়াহ্ইয়া আল-মুযনীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ইমাম আল মুযনী ছিলেন ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর ছাত্র এবং বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফাসসির। ইমাম তাহাবী (রঃ)-ও প্রথমে শাফেয়ী মযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরে হানাফী মযহাবের শিক্ষকের নিকট উক্ত শিক্ষা লাভ করেন। এসময় হানাফী ফিকাহ্র প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তিনি ফিকাহ শাস্ত্র গুলো তুলনামূলক অধ্যয়ন করেন এবং হানাফী মতে প্রভাবিত হন। এভাবে পরে বিশ বছর বয়সে তিনি হানাফী মযহাব গ্রহণ করেন। এটা প্রবৃত্তির কামনায় নয় বরং সত্যের অন্বেষায় এবং এর প্রাপ্তিতে। আর স্বজ্ঞানে ও দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে।

ইসলামী বিশ্বের খ্যাতমান আলেম, ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ একবাক্যে ইমাম তাহাবী (রঃ) কে হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রের ইমাম, মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদ বলে অভিহিত করেছেন। তাদের মধ্যে ইবনে আসাকির (রঃ), ইবনে আবদুল বার (রঃ), আল্লামা সামআনী (রঃ), আল্লামা ইবনে জওযী (রঃ), হাফেজ যাহাবীর, আল্লামা হাফেজ ইবনে কাসীর (রঃ), আল্লামা সুয়ুতী (রঃ), আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রঃ), মুহাদ্দিস তাবারী (রঃ), খতীবে বাগদাদী (রঃ) ও শাহ আবদুল আযীয (রঃ) অন্যতম। তাঁদের কয়েক জনের উক্তি নিচে দেয়া হল।

* শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রঃ 'বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন' কিতাবে বলেন, "ইমাম তাহাবীর রচিত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমেই তাঁর জ্ঞানের প্রসারতার সন্ধান পাওয়া যায় (তাঁর রচিত মুশকিলাতে তাহাবী অধ্যয়ন করলে প্রমাণিত হয় যে, তিনি হানাফী মাযহাবের একজন মুকাল্লিদ মাত্র ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন

একজন মুজতাহিদ মুনতাসিব" (পৃ-১৪৪-৪৫)।

* সহীহ্ আল বুখারী শরীফের অন্যতম ভাষ্যকার আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী বলেন, আমাদের পূর্ববর্তী সকল মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা নির্ণয়ে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে (ইজতেহাদ) ইমাম তাহাবী ছিলেন একজন দক্ষ-প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। হাদীসের বর্ণনা ও রিজালশাস্ত্রে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও সুনানগ্রন্থ রচয়িতাগণের ন্যায় তিনিও ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত এবং 'হুজ্জাত' হিসেবে গ্রহণীয়।

* ইবনে আসাকির তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে ইবনে ইউনুসের মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন, "ইমাম তাহাবী ছিলেন একজন বিশ্বস্ত ও প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞাবান ফিকাহশাস্ত্রবিদ। পরবর্তীকালে তাঁর মত আর কেউ জন্মগ্রহণ করেননি।" (৭ম খন্ড, পৃ-৩৬৮)

* ইবনে আবদুল বার তাঁর 'আল জাওয়াহিরুল মজিয়া' গ্রন্থে বলেন, "তিনি (ইমাম তাহাবী) সকল ফিকাহ শাস্ত্রবিদের মাযহাবসহ কুফাবাসী আলেমদের জীবন ইতিহাস ও ফিকাহশাস্ত্র সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত ছিলেন।

* হাফেজ যাহাবী তাঁর প্রসিদ্ধ জীবন চরিত 'সিয়ার আলামিন আন-নুবালা' কিতাবে বলেন, ইমাম তাহবী ছিলেন একজন ইমাম, আল্লামা, মহান হাফেজে হাদীস এবং মিসরের অন্যতম স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও প্রতিষ্ঠিত ফিকাহশাস্ত্রবিদ... এই ইমামের গ্রন্থাবলী যে অধ্যয়ন করবে সে জ্ঞানের প্রশস্ততা ও স্তর সম্পর্কে সঠিকভবে জানতে পারবে। (খন্ড-১৫ পৃঃ-২৭)

* আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর আল বেদায়া গ্রন্থে বলেন, ইমাম তাহাবী ছিলেন হানাফী ফেকাহশাস্ত্রবিদ, বহু মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা একজন প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস এবং অন্যতম হাফেজে হাদীস।"(খন্ড-১১পৃঃ-১৮৬)

আল্লামা তাহাবী (রঃ) আকীদা, তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ ও ইতিহাসের উপর অনেক মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন। এর অনেক গুলোই প্রকাশিত হয়েছে। বেশ কয়েকটি হাতে লেখা পান্ডুলিপি আকারেও রয়েছে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ

---

(١) ابن ماجه في كتاب الفتن– وابن ابي عاصم في السنة– والحاكم في المستدرك–

১. আল্লামা আলবানী বলেছেনঃ এ হাদীস অবশ্যই সহীহ। কেননা হযরত আনাস (রাঃ) থেকে এটি আরো বহু সূত্রে বর্ণিত। অনেক সাহাবী এ হাদীস সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

কিতাবগুলোর অন্যতম হল 'আকীদায়ে তাহাবীয়া'। এটি আরবী ভাষায় লিখিত। সংক্ষিপ্ত হলেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব। কুরআন সুন্নাহর আলোকে এবং সালাফে সালেহীনের আকীদার অনুসরণে লিখিত। চার মযহাব এবং আহলে হাদীসের অনুসারী আলেমগণের সর্বসম্মত রায়ে এ কিতাবে লিখিত আকীদা গুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতেরই আকীদা।

ইমাম তাহাবী-রঃ-ই প্রথম আজ থেকে এগার শ বছর পূর্বে এ আকীদাগুলো সূত্রাকারে একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন। মুসলিম জাহানের প্রায় সর্বত্রই একিতাবটি বিভিন্ন মাযহাব নির্বিশেষে সুন্নী জামায়াতের ওলামা ও সাধারণ পাঠকদের নিকট সমান গৃহীত, পঠিত ও সম্মানিত। এটির ন্যায় তাঁর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হল 'শারহু মা'আনিল আসার'। ভারতীয় উপমহাদেশ ও মিসর সহ বিভিন্ন দেশে এটি অসংখ্য বার মুদ্রিত ও ব্যাপক পরিচিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন মাদ্রাসায় এটি পাঠ্য এবং শিক্ষার্থীদের জন্য এক অনুপম উপহার। এদু'টি কিতাব তাঁকে মুসলিম জাহানে স্মরণীয় করে রেখেছে। ঐতিহাসিক গণের মতে তাঁর লিখিত কিতাবের সংখ্যা ত্রিশের উর্ধ্বে।

রাসুল্লাহ (সাঃ) যে আকীদার উপর ইসলামী সমাজ ও ইসলামী জামায়াত কায়েম করেছিলেন, মুসলিম উম্মাহ তার উপর আস্থাশীল। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে যে সব আকীদা-বিশ্বাস ও মূলনীতি সর্বসম্মত ভাবে চালু ও গৃহীত হয়েছিল, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং সাধারণ মুসলমানদের বৃহত্তম অংশ সেগুলোকে ইসলামী আকীদা ও আদর্শ বলে বিশ্বাস করে আসছেন। তা কবুলে মুসলমানরা বাধ্য। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ-

عن عبد الله بن عمر رضـ قال قال رسول الله صلى عليه وسلم ان بني اسرائيل تفرقت على اثنتي وسبعين ملة وستفرق امتي على ثلث وسبعين ملة كلهم في النار الا ملة واحدة – قالوا من هي يارسول الله قال ما انا عليه واصحابي–

(رواه الترمذی)

তরজমা ঃ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ

(সাঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈল বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। আমার উম্মাত তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে। একটি দল ছাড়া আর সব ফেরকা জাহান্নামে যাবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লার রাসূল, সে দল কোনটি? তিনি জবাব দিলেন, আমার এবং আমার সাহাবীদের নীতির উপর যে দল প্রতিষ্ঠিত। (তিরমিযী)

عن معاوية بن ابي سفيان رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أهل الكتابين افترقوا فى دينهم على ثنتين وسبعين ملة – ان هذه الامة ستفترق على ثلث وسبعين ملة (يعنى على الاهواء) كلها فى النار الا واحدة – وهى الجماعة – ابوداود – ٤٥٩٧ – فى سننه – باب شرح السنه – والدارمى– ٣٥٢١ السير ما فى افتراق هذه الامة واحمد فى المسند ٤/٢ ، ١٠٢– واسناده صحيح – قوله الكتابين هو عند احمد –)

তরজমা :- হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় দু'টি আহলে কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টানরা) তাদের ধর্মে বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। আর আমার এই উম্মাত অনতিকাল পরে বিভক্ত হবে তিয়াত্তর ফেরকায় (অর্থাৎ লালসা প্রভৃত)। একটি দল ভিন্ন অন্য সবাই যাবে জাহান্নামে। আর সে একটি হলো 'আল-জামায়াত'। (আবু দাউদ, দারেমী, আহমদ)।

عن عبد الله بن عمرو رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتينّ على امتى ما اتى على بنى اسرائيل حذو النعل بالنعل حتى ان كان منهم من اتى امّه علانيةً كان من امتى من يصنع ذلك – وان بنى اسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملةً وتفترق امتى على ثلث وسبعين ملة – كلهم فى النار الا ملةً واحدة – قالوا من هى يارسول الله – قال من انا عليه واصحابى – (رواه الترمذى – ٢٦٤٣ وقال هذا حديث حسن غريب) (١)

তরজমা ঃ- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, বনী- ইসরাঈলের যে অবস্থা হয়েছিল, আমার উম্মাতের অবশ্যই হুবহু সে অবস্থা হবে। এমন কি তাদের কেউ প্রকাশ্যে তার মায়ের উপর পতিত হলে আমার উম্মাতের লোকও তা করবে। বনী-ইসরাঈল ৭২ ফেরকায় ভাগ হয়েছে। আমার উম্মাত বিভক্ত হবে ৭৩ ফেরকায়। একটি দল ছাড়া আর সবাই জাহান্নামে যাবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লার রাসূল (সাঃ) সে দল কোনটি? তিনি বললেন, যে নীতির উপর আমি ও আমার সাহাবারা ছিল। "তিরমিযী"।

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন, তোমাদের যারা কোন নীতি ও পন্থা অনুসরণ করতে চায় অবশ্যই তারা যেন মৃত ব্যক্তিগণের নীতি অনুসরণ করে। কেননা জীবিতরা ফিতনা থেকে নিরাপদ নয়। সেই (মৃত) ব্যক্তিগণ হলেন মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবায়ে কেরাম। তাঁরা ছিলেন উম্মাতের সর্বোত্তম ও বুজর্গতম ব্যক্তি, মনের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় নেককার, জ্ঞান ও ইলমের দিক দিয়ে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী। আর তাদের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিলনা বললেই চলে। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের কে তাঁর নবীর সাথী ও সাহাবী হওয়া এবং তাঁর দীন কায়েম করার জন্যেই মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের সঠিক মর্যাদা চিনে রেখো, তাঁদের কথায় তাঁদেরকে অনুসরণ কর, তাঁদের দীন ও চরিত্র যথাসাধ্য দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। কেননা, তাঁরাই ছিলেন সিরাতুল মোস্তাকিম বা সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত। (শরহে আকীদায়ে তাহাবীয়া, ইবনে আবিল ইযয্, দামেশক, পৃঃ- ৪৩২)

বস্তুত ইসলামের সমস্ত আকীদা-বিশ্বাস অতি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট এবং প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) কুরআন-সুন্নায় তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সহ ইসলামী আকীদাগুলো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট রূপে বর্ণনা করে দিয়েছেন। মানুষের কল্পনা ও ধ্যান-ধারনার কোন স্থান এতে নেই। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত ইসলামী আকীদা বিশ্বাস বর্জন করে নিজেদের কল্পনা ও চিন্তা চেতনার আলোকে নতুন নতুন আকীদা রচনা করে কিছু লোক অতীতে যেমন বিভিন্ন বাতিল ফেরকা সৃষ্টি করেছে বর্তমানেও অনেকে তা করে চলেছে এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে গোমরাহীর দিকে নিয়ে গেছে ও যাচ্ছে। উম্মাতের মধ্যে নানারূপ বিভ্রান্তি, বিদয়াত ও কুপ্রথার জন্ম দিচ্ছে।

ইমাম তাহাবী (রঃ) এর যুগে এ আকীদাগুলোর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিলনা। কারন, তখন ইসলামী রাষ্ট্র ছিল, ইসলামী সরকার ছিল। কুরআন-সুন্নাহর আইন চালু ছিল। ইসলামী শিক্ষা ছিল, ইসলামী শাসন ও বিচার ছিল। একই খলীফার নেতৃত্বে গোটা মুসলিম উম্মাহ একই জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন বিশ্বে মুসলমানরাই সেরা শক্তি ছিল। জিহাদ অব্যাহত ছিল। ইসলামের এসব পরিভাষা ও আকীদার ভাব ও রূপ মুসলমানদের জানা ছিল। ব্যাখ্যার তখন দরকার পড়তোনা। তাই ইমাম তাহাবী (রঃ) কেবল সংক্ষেপে আকীদা গুলোই লিখে গেছেন। কোনটির ব্যাখ্যা দেন নি। কিন্তু বিগত কয়েকশ বছরের পতন, পরাধীনতা ও অজ্ঞতার কারণে এসব ইসলামী পরিভাষা ও আকীদা মুসলমানদের নিকট প্রায় অপরিচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আজ এসবের ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। এজন্য এ কিতাবে আকীদাগুলোর প্রয়োজনীয় অংশের ও শব্দের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতার তাগীদেই এ কিতাবের অনুবাদসহ বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্বলিত টীকার সংযোজন করা হয়েছে। মূল কিতাবের নাম আল-আকীদাতুত্ তাহাবীয়া। অনুবাদে নাম দেয়া হয়েছে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা।' মূল অনুবাদের সম্পাদনার কষ্ট স্বীকার করে আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থা বাংলাদেশের সাবেক পরিচালক, বিশিষ্ট আলেম মক্কা মুকাররমার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আহমদ আল বান্নানী আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন ঢাকা দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক বন্ধুবর জনাব হেলাল আহমদ। প্রশংসা করে তাঁদের খাটো করবনা। বিনিময় দেবেন কেবল মহান আল্লাহ।

কিতাবটি কারো আকীদা সংশোধনের সহায়ক হলে শ্রম সার্থক মনে করব এবং আখিরাতে বিনিময় চাইব। কোন ভুল ভ্রান্তি ও ত্রুটি বিচ্যুতি নযরে আসলে সরাসরি আমাকে অবহিত করলে সম্মানিত উলামায়ে কিরামের নিকট কৃতজ্ঞ থাকব। রাব্বুল আলামীনের কাছে কিতাবটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

তাং ১-৮-৯৫ ইং

মোঃ ফজলে আমীন
চেয়ারম্যান
ইসলাম প্রচার সমিতি

بسم الله الرحمن الرحيم

[পরম করুণাময় অতি দয়াবান আল্লাহর নামে শুরু করছি]

نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله :

١- ان الله واحد - لاشريك له -

তরজমাঃ আল্লাহ তায়ালার তাওফীক লাভের পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে আমরা আল্লাহর তাওহীদ* অর্থাৎ একত্ববাদ সম্পর্কে বলছিঃ

১। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এক। তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই।

টীকাঃ * তাওহীদ ঃ তাওহীদ ইসলামের উৎস, প্রথম রুকন বা খুঁটি, ঈমানের প্রথম ভিত্তি, নবী-রাসূলগণের প্রথম দাওয়াত, মুসলমানদের প্রথম সাক্ষ্য ও আকীদা, তাওহীদী জনতার ঐক্যের প্রতীক, দীনের প্রাণ এবং যাবতীয় আমল ও ক্রিয়াকর্মের মূল।

তাওহীদ- এর মূল ধাতু হলো আরবী واحد ওয়াহেদ। মানে এক। তাওহীদ মানে এক মানা ও এক স্বীকার করা। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এক, একক ও অদ্বিতীয়, কথা ও কাজে তাঁর একত্বে ও এককত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। তিনি ওয়াজিবুল ওজুদ- তাঁর অস্তিত্ব অপরিহার্য, তিনি অবশ্যই বর্তমান আছেন। তিনিই একমাত্র বিশ্ব ও বিশ্বে যা কিছু আছে সব কিছুর স্রষ্টা, আইন দাতা, রিযিকদাতা, পালনকর্তা, মহাব্যবস্থাপক, মহা পরিচালক, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। এসব ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। দুনিয়া আখিরাতে তাঁর সৃষ্টির সব ব্যাপারে তিনিই একমাত্র কর্তৃত্বের অধিকারী ও ক্ষমতাবান, সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। কথা ও কাজে উল্লেখিত সব ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার একক অধিকার ও ক্ষমতায় দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো তাওহীদ। এসব ব্যাপারে কোন ব্যক্তি, শক্তি বা গোষ্ঠীকে সামান্যতম অংশীদার মনে করলে সমস্ত ঈমানই বরবাদ হয়ে যায়। এতে সব উলামাই একমত।

আল্লাহ তায়ালার রাসূল ও প্রতিনিধি হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের

بسم الله الرحمن الرحيم

[পরম করুণাময় অতি দয়াবান আল্লাহর নামে শুরু করছি]

نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله :

١- ان الله واحد - لاشريك له -

তরজমাঃ আল্লাহ তায়ালার তাওফীক লাভের পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে আমরা আল্লাহর তাওহীদ* অর্থাৎ একত্ববাদ সম্পর্কে বলছিঃ

১। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এক। তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই।

টীকাঃ * তাওহীদ ঃ তাওহীদ ইসলামের উৎস, প্রথম রুকন বা খুঁটি, ঈমানের প্রথম ভিত্তি, নবী-রাসূলগণের প্রথম দাওয়াত, মুসলমানদের প্রথম সাক্ষ্য ও আকীদা, তাওহীদী জনতার ঐক্যের প্রতীক, দীনের প্রাণ এবং যাবতীয় আমল ও ক্রিয়াকর্মের মূল।

তাওহীদ- এর মূল ধাতু হলো আরবী واحد ওয়াহেদ। মানে এক। তাওহীদ মানে এক মানা ও এক স্বীকার করা। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এক, একক ও অদ্বিতীয়, কথা ও কাজে তাঁর একত্বে ও এককত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। তিনি ওয়াজিবুল ওজুদ- তাঁর অস্তিত্ব অপরিহার্য, তিনি অবশ্যই বর্তমান আছেন। তিনিই একমাত্র বিশ্ব ও বিশ্বে যা কিছু আছে সব কিছুর স্রষ্টা, আইন দাতা, রিযিকদাতা, পালনকর্তা, মহাব্যবস্থাপক, মহা পরিচালক, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। এসব ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। দুনিয়া আখিরাতে তাঁর সৃষ্টির সব ব্যাপারে তিনিই একমাত্র কর্তৃত্বের অধিকারী ও ক্ষমতাবান, সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। কথা ও কাজে উল্লেখিত সব ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার একক অধিকার ও ক্ষমতায় দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো তাওহীদ। এসব ব্যাপারে কোন ব্যক্তি, শক্তি বা গোষ্ঠীকে সামান্যতম অংশীদার মনে করলে সমস্ত ঈমানই বরবাদ হয়ে যায়। এতে সব উলামাই একমত।

আল্লাহ তায়ালার রাসূল ও প্রতিনিধি হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদেরকে

٢. ولاشئ مثله-

٣. ولاشئ يعجزه-

তরজমাঃ

২. তাঁর মতো কোন কিছুই নেই।

৩. কোন কিছু তাঁকে অক্ষম করতে সক্ষম নয়।

আনুগত্য লাভের অধিকারী। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) বিধানই হচ্ছে সর্বোচ্চ ও পূর্ণাঙ্গ বিধান। মানব জীবনের কোন ক্ষেত্রে, দিক ও বিভাগে এই বিধানের আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোন বিধান, মত ও পথ মানা যেতে পারে না। সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীন এ বিধান, মত ও পথেরই অনুসারী ছিলেন। যারা এ বিধান, মত ও পথের অনুসারী হবে তারাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত।

তাওহীদের চারটি দিক রয়েছেঃ

ক. আল্লার জাত বা মূল সত্তা খ. তাঁর গুনাবলী, গ. তাঁর ইখতিয়ারাত বা ক্ষমতা সমূহ এবং ঘ. তাঁর হুকুক বা অধিকার সমূহ। এচারটি বিষয়ে কাউকে শরীক করা যাবেনা। নিরংকুশভাবে আল্লাহরই জন্য এচারটি বিষয়কে নির্দিষ্ট রাখতে হবে। তাঁর মূল সত্তায়, তাঁর গুণাবলী, তাঁর ইখতিয়ারাত বা তাঁর অধিকারের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে শরীক মনে করাই শিরক।

ক. খোদায়ীর ব্যাপারে কাউকে অংশীদার মানলে আল্লার মূল সত্তায় শিরক হয়। যেমন, খৃষ্টানদের তিন খোদায় বিশ্বাস, অন্যান্য মুশরিকদের দেব-দেবীকে বা নিজেদের জাতি, বংশ বা রাজাকে খোদার জাত বা সত্তার অংশ মনে করা ইত্যাদি।

খ. আল্লার বিশেষ গুণাবলী যেমনভাবে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলো বা তার কোন একটি তেমনি ভাবে অপর কারো মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস করলে শিরক হয়। যেমন, কেউ গায়েব জানে বা গায়েবী জগতের সব তত্ত্ব ও তথ্য তার কাছে স্পষ্ট, কিংবা সে সব কিছু জানে, শোনে বা সে সকল প্রকার দুর্বলতা, অক্ষমতা ও সব দোষ-ত্রুটি মুক্ত এ রূপ মনে করা শিরক।

গ. আল্লার জন্য বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট ক্ষমতা-ইখতিয়ার সমূহ বা এসবের কোনটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আছে বলে মেনে নেয়া শিরক। যেমন, অতি

٤- ولا اله غيره -

٥- قديم بلا ابتداء - دائم بلا انتهاء -

তরজমাঃ

৪. তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। অর্থাৎ তিনি ছাড়া কোন প্রকৃত মা'বুদ নেই।

৫. তিনি আদিহীন অনাদি। তিনি অন্তহীন চিরন্তন, অর্থাৎ তাঁর আগেও কেউ নেউ, কিছু নেই। তাঁর পরেও নেই।

প্রাকৃত উপায়ে উপকার, ক্ষতি, প্রয়োজন পূরণ, অভাব মোচন, সাহায্য-সহায়তা, হেফাজত, দোয়া কবুল, ভাগ্য গড়া ও নষ্ট করা, কোন কিছু হালাল-হারাম, জায়েজ-নাজায়েজ করা এবং মানব জীবনের জন্য আইন, দেশ ও জাতির জন্য বিধান রচনা করা। মূলত এসবই আল্লার বিশেষ ক্ষমতা। এর কোন একটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আছে বলে মেনে নেয়াই হচ্ছে শিরক।

খ. বান্দাদের উপর আল্লার যেসব বিশেষ অধিকার রয়েছে সেসব বা তার কোন একটি অধিকার আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য মেনে নেয়া শিরক। যেমন, রুকু-সিজদা, হাত জোড় করে মাথা নীচু করে দাঁড়ানো, নিয়ামতের শোকর বা শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি হিসেবে মানত করা, নযর-নিয়াজ ও বলি দেয়া, প্রয়োজন পূরণ ও বিপদ মুক্তির আশায় মানত মানা, বিপদ-মুসীবতে মুক্তি দিতে পারে মনে করে সাহায্য চাওয়া প্রভৃতি একমাত্র আল্লারই জন্য নির্দিষ্ট-তাঁরই অধিকার। অন্য কারো এরূপ কোন অধিকার আছে মনে করা শিরক। তদ্রূপ আল্লার ভয় ও ভালবাসার উর্ধ্বে অপর কারো ভয় ও ভালবাসাকে স্থান দেয়া। অন্য কারো ভয়, ভালবাসা ও আনুগত্য আল্লার দেয়া শর্তাধীনে হবে, শর্তহীন নয়। পথ, মত ও নির্দেশের মানদন্ড কেবল তাঁর বিধানকেই মনে করতে হবে। তাঁর আইন-বিধানের সনদ ও অনুমোদন ছাড়া অন্য কারো আইন বিধান মানা যাবেনা। এসব অধিকারের কোন একটি অধিকার আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দেয়া বা অন্য কারো এরূপ কোন অধিকার আছে বলে মনে করা শিরক। আল্লার কোন নামে তার নামকরণ করা হোক না না হোক, তাতে কিছু আসে যায়না।

১। তাওহীদের দাওয়াতই ছিল সব নবীর প্রথম দাওয়াত। হযরত নূহ আঃ থেকে সব নবীই এ দাওয়াত দিয়েছেন।

٦- لايفنى ولايبيد -

٧- ولايكون الامايريد-

৬. তাঁর বিনাশ নেই অর্থাৎ তিনি অক্ষয়, অব্যয় ও অবিনাশী। তাঁর বিলোপ নেই অর্থাৎ ক্ষয় নেই, লয় নেই, পতন নেই।

৭. তিনি যা চান কেবল তা-ই হয়।

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ -

'হে আমার জাতি, তোমরা আল্লার ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নেই। (সূরা আল-আরাফ)

রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

أُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ -

'আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে মানুষের সাথে লড়াই ও যুদ্ধ করতে, যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লার রাসূল।' (বুখারী- ১ম জিলদ, পৃষ্ঠা- ৭০-৭৭, ঈমান, মুসলিম-ঈমান, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত)

আল্লাহ্ তায়ালার একক সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা বান্দার অবশ্য কর্তব্য। তাঁর অস্তিত্ব অপরিহার্য।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ -

'হে নবী, বলুন, তিনি আল্লাহ্ একক। (আল-ইখলাস-১)

আল্লাহ্ তায়ালার গুণ বাচক নাম ৯৯টি। এগুলোর উপর ঈমান আনতে হবে।

لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى -

'তার জন্য অতীব উত্তমও সুন্দর সুন্দর (গুণবাচক) নাম সমূহ রয়েছে।' (আল-হাশর-২৪)

কুরআন মজীদ এবং তিরমিযি শরীফ ও ইবনে মাজায় হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে এ নামগুলোর উল্লেখ রয়েছে।

আসমান যমীনের স্রষ্টা তিনিই-

٨- لاتبلغه الاوهام - ولاتدركه الافهام -

٩- ولايشبه الانام -

١٠- حي لايموت - قيوم لاينام -

١١- خالق بلا حاجة - رازق بلا مؤنة -

١٢- مميت بلا مخافة - باعث بلا مشقة -

৮. তিনি ধারনা, কল্পনা ও অনুমানের বাইরে এবং আকল-বুদ্ধির অগম্য অর্থাৎ তিনি বুদ্ধি গ্রাহ্য নন।

৯. তিনি সৃষ্টি কুলের সদৃশ নন।

১০. তিনি শাশ্বত ও চিরঞ্জীব। তাঁর কোন মৃত্যু নেই। তিনি চিরস্থায়ী, গোটা সৃষ্টি লোককে দৃঢ় ভাবে ধারণ করে আছেন। তাঁর নিদ্রা নেই (তন্দ্রাও নেই)।

১১. তিনি (সব কিছুর) স্রষ্টা। অথচ তাঁর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। তিনি রিযিকদাতা, সকল কে রিযিক তিনিই দেন। অথচ এতে তাঁর কোনই কষ্ট হয়না।

১২. তিনি নির্ভয়ে মৃত্যু দাতা। বিন্দুমাত্র কষ্ট ছাড়াই তিনি (সবাইকে) পুনরুজ্জীবিত করবেন।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ -

'এবং তিনিই সব আসমান ও যমীনকে যথাযথ ভাবে সৃষ্টি করেছেন।' (আল-আন'আম-৭৩)

২। সব কিছু তাঁর, হুকুমও চলবে তাঁর।

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ -

'সাবধান, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও তাঁরই। (আল-আ'রাফ-৫৪)

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ -

আকাশ থেকে যমীন পর্যন্ত দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালনা তিনিই করেন। (আস্-সাজদাহ্-৫)

৩। বিশ্ব-জাহানে সর্বত্র সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার। যা অত

١٣- مازال بصفاته قديما قبل خلقه - لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفته - وكما كان بصفاته ازليًا كذلك لايزال عليها أبديًا-

١٤- ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق - ولا باحداث البرية استفاد اسم البارى -

১৩. সমগ্র সৃষ্টি লোক সৃষ্টি করার পূর্বেই তিনি তাঁর সমস্ত গুণাবলী সহ অনাদিকাল থেকেই শাশ্বত সত্তারূপে বিদ্যমান আছেন। অস্তিত্বহীনতা থেকে মাখলুকের অস্তিত্ব লাভের কারণে তাঁর গুণে কোন সংযোজন ঘটেনি। যে ভাবে তিনি তাঁর যাবতীয় গুণাবলী সহ শাশ্বত ও অনাদি, তেমনি তিনি সমস্ত গুনাবলী সহ অনন্ত ও চিরন্তন।

১৪. মাখলূক কে সৃষ্টি করার পরেই কেবল তাঁর নাম খালেক বা স্রষ্টা হয়নি। (বরং সৃষ্টির পূর্বেও অনাদিকালেই তিনি এ স্রষ্টা গুণে গুণান্বিত)। তদ্রূপ এ সৃষ্টি পরিকল্পনাকে অস্তিত্ব দান ও বাস্তবায়নের কারণেই তিনি 'বারী' বা বাস্তবায়নকারী ও বাস্তব রূপ দানকারী নামের অভিধা পাননি। (বরং অনাদি ও অনন্তকাল ব্যাপী এ গুণে তিনি গুণমন্ডিত)।

কারো নেই, হতেও পারেনা। তাঁর সার্বভৌমত্বে অংশীদারও কেউ নেই।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

তুমি কি জাননা যে, আসমান-যমীনের বাদশাহী একমাত্র আল্লার? (আল-বাকারা-১০৭)

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ -

এবং বাদশাহীতে ও শাসন কর্তৃত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। (আল-ফুরকান-২)

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ -

আল্লাহ ছাড়া আর কারো ফয়সালার ও হুকুম দেয়ার ইখতিয়ার নেই।

١٥- له معنى الربوبية ولا مربوب - ومعنى الخالق ولا مخلوق -

١٦- وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا - استحق هذا الاسم قبل احيائهم - كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم -

১৫. প্রতিপালন ব্যতীতই (অনাদি কাল থেকেই) তিনি প্রতিপালকগুণে ভূষিত। অনুরূপ মাখলুক বা সৃষ্টির অবিদ্যমানেও তিনি খালেক বা স্রষ্টা গুণের অধিকারী।

১৬. তিনি মাখলুককে জীবনদানের পর মৃত্যু দান করবেন এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করবেন। কিন্তু মৃত্যুর পর পুনরায় জীবনদানের পূর্বেই তিনি مُحْيِي বা জীবনদানকারী- এ নাম পাওয়ার যোগ্য। ঠিক তদ্রূপ মাখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই তিনি খালেক অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা নামীয় গুণের অধিকারী।

(আল-আন-'আম)-৫৯)

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ -

আল্লাহ্ ফয়সালা করেন, হুকুম দেন। তাঁর ফয়সালা পুনর্বিবেচনা করার কেউ নেই। (আল-রা'দ-৪১)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ -

হে নবী, বল, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার সব ইবাদত-বন্দেগী ও কুরবানী, আমার জীবন-মৃত্যু সব কিছুই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। এ বিষয়েই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম মুসলমান হলাম। (আল-আন্'আম- ১৬২-৬৩)

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -

١٧- ذلك بانه على كل شئ قدير - وكل شئ اليه فقير - وكل امر عليه يسير - لايحتاج الى شئ - لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَئٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ -

١٨- خلق الخلق بعلمه -

١٩- وقدر لهم اقدارا -

১৭. এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান এবং গোটা সৃষ্টিলোকের সবকিছু তাঁরই মুখাপেক্ষী। সব বিষয়ই তাঁর নিকট অতিসহজ। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَئٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ -

"তাঁর অনুরূপ কোন কিছুই নেই এবং তিনি সব কিছুই শোনেন ও দেখেন।" (আশ-শুরা-১১)

১৮. আল্লাহ তায়ালা নিজ জ্ঞানে মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। (অর্থাৎ তাঁর ইলম চিরন্তন। যখন কোন কিছু করেন, তার এই ইলম তখন নতুনভাবে অর্জিত হয়না)।

১৯. তিনি মাখলুকাতের তাকদীর বা পরিমাণ নির্ধারণ ও ভাগ্যের ফয়সালা করেছেন।

অতঃপর আমি তোমাকে দীনের এক বিশেষ তরীকা ও শরীয়াতের ওপর স্থাপন করলাম সুতরাং তুমি তারই অনুসরণ কর। আর যাদের ইলম নেই, জাহেল, তাদের খাহেশের অনুসরণ করোনা। (আল-জাসিয়া-১৮)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ -

আল্লার নাযিল করা বিধান মুতাবিক যারা ফয়সালা করেনা, তারা কাফের। (আল-মায়েদা-৪৪)

ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক- যে কোন বিষয়ে আল্লার বিধানের বিপরীত ফয়সালা, হুকুম, নির্দেশ বা আইন রচনা করা কেবল হারামই নয়-বরং

٢٠- وضرب لهم اٰجالا -

٢١- ولم يخف عليه شئ قبل ان يخلقهم - وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم -

২০. তিনি সকলের মৃত্যুর ও শেষ পরিণতির ক্ষণটাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

২১. মাখলুকাত সৃষ্টি করার আগে তাদের কোন কিছুই আল্লাহ তায়ালার কাছে গোপন ও অজানা ছিলনা। বরং তারা কে কি করবে, তাদের সৃষ্টির পূর্বেও তিনি তা জানতেন।

কুফরী, গোমরাহী, যুলুম, শিরক, ফাসেকী। (সূরা মায়েদার ৪৫-৪৭ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)

উপরোক্ত আয়াত গুলোর অর্থবিশিষ্ট আরো অসংখ্য আয়াত রয়েছে, হাদীস রয়েছে অগণিত। এসব ব্যাপারে আল্লার একক সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল বা জনগণ সার্বভৌমত্বের অধিকারী নয়। যারা এ মতে বিশ্বাসী নয় তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটাই তাওহীদের মর্মবাণী। ইমাম তাহাবী (রঃ)- এর তাওহীদ সংক্রান্ত সুন্নী আকীদার এটাই সার কথা।

٢٢– وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته –

২২. তিনি সবাইকে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নাফরমানি করতে ও অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন।

টীকাঃ

২২। জীবনের সব ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লার বিধানই মানতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই নাফরমানী করা যাবে না।

اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَاءَ–

তোমাদের রবের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযির হয়েছে তার অনুসরণ কর। তা বাদ দিয়ে তোমাদের নেতাদের অনুসরণ করো না। (আল-আ'রাফ-৩)

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ –

আল্লাহ্ ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয় স্বজনকে দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন। এবং অশ্লীলতা, অন্যায় ও বিদ্রোহ্ করতে নিষেধ করছেন। (আল-নাহল-৯০)

٢٣- وكل شئ يجرى بتقديره ومشيئته - ومشيئته تنفذ - لامشيئة للعباد إلا ماشاء لهم - فما شاء لهم كان- وما لم يشأ لم يكن -

٢٤- يهدى من يشاء - ويعصم ويعافى فضلا - ويضل من يشاء - ويخذل ويبتلى عدلا -

٢٥- وكلهم يتقلبون فى مشيئته - بين فضله وعدله -

٢٦- وهو متعال عن الاضداد والأنداد -

٢٧- ولا راد لقضائه ولامعقب لحكمه ولاغالب لأمره -

তরজমাঃ

২৩. সব কিছুই আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণ (তাকদীর) এবং ইচ্ছা অনুসারে চালিত হয়। আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকর হয়েই থাকে। বান্দার ইচ্ছা কেবল ততটুকুই কার্যকর হয়, আল্লাহ যতটুকু তাদের জন্য ইচ্ছা করেন সুতরাং তিনি বান্দাদের জন্য যা চান, তাই হয়। আর যা চান না, তা হয় না।

২৪. আল্লাহ্ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে যাকে চান হেদায়াত দেন, বিপদে বাঁচান এবং নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করেন। আর তিনি যাকে চান, সম্পূর্ণ ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে তাকে গোমরাহ ও অপমানিত করেন, নানারূপ পরীক্ষায় ফেলেন।

২৫. আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছার গন্ডিতেই তাঁর ইনসাফ ও অনুগ্রহের মাঝেই সবাই আবর্তিত হয়ে থাকে।

২৬. আল্লাহ তায়ালা কারো প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী এবং শরীক ও সমকক্ষ হওয়ার অনেক ঊর্ধ্বে।

২৭. না পারে কেউ তাঁর কোন ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত রদ করতে। আর না পারে কেউ তাঁর কোন হুকুম মুলতবি রাখতে (তিনি অজেয়।) তাঁর কোন ফরমান ও আদেশকে পরাভূত ও প্রভাবিত করার কেউ নেই।

٢٨- آمنا بذلك كله - وأيقنا أن كلا من عنده -

٢٩- وان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى -

২৮. (তাওহীদ সংক্রান্ত) উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রত্যেকটির উপর আমরা দৃঢ় ঈমান এনেছি। আমরা দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করেছি যে, সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকেই হয়ে থাকে।

২৯। নিশ্চয় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তায়ালার মনোনীত বান্দাহ্, তাঁর নির্বাচিত নবী ও পছন্দনীয় রাসূল।

টীকা ঃ ২৯। রাসূলের (সাঃ) প্রতি ঈমান আনার অর্থ হল-জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে, প্রতি ক্ষণে, সব কাজে, প্রত্যেক স্থলে রাসূল (সাঃ) কে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিনিধি ও রাসূল হিসেবে বাধ্যতামূলক ভাবে মেনে চলা। তাঁর পদাংক অনুসরণ করা। এ সবই ফরয। আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ। আল্লাহ বলেন-

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ -

অর্থ ঃ মূলত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যেন আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁদের আদেশ নিষেধ মানা করা হয়। (আন্-নিসা-৬৪)

জীবনের কোন ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) এর বিপরীত অন্য কারো আনুগত্য করা, আদেশ নিষেধ মানা ও অনুসরণ করা স্বয়ং রাসূল (সাঃ) কে অস্বীকার করারই নামান্তর। বস্তুত রাসূল (সাঃ) এর শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা মুনাফেকী এবং এর বিরোধিতা করা কুফরী।

আল্লাহ্ তায়ালা রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে যে দীন পাঠিয়েছেন, তার নাম ইসলাম। ইসলামের অর্থ-নিজকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সামনে, তাঁর আনুগত্যে সোপর্দ করে দেয়া। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ঃ

٣٠- وأنه خاتم الانبيـاء وإمام الاتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين -

٣١- وكل دعوى النبوة بعده فغى وهوى -

৩০। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) শেষ নবী, মুত্তাকীদের নেতা, নবী রাসূলগণের সর্দার এবং রাব্বুল আলামীনের হাবীব (ঘনিষ্ঠ বন্ধু)।

৩১। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পর নবুওয়াতীর যত দাবী, সবই মিথ্যা ও ভ্রান্ত এবং প্রবৃত্তি প্রসূত ও লালসা।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً - وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطَانِ - إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (আল বাক্কারা- ২০৮)

আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী এখানে اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً বাক্যটির গঠন হচ্ছে অবস্থাজ্ঞাপক। এর দুটি অর্থ দাঁড়ায়। প্রথম হল- اُدْخُلُوْا র মধ্যে (তোমরা প্রবেশ কর) এতে যে 'তোমরা' সর্বনাম রয়েছে তার অবস্থার জ্ঞাপন করছে। অথবা ইসলাম অর্থে যে سلم শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তার অবস্থা জ্ঞাপন করছে।

প্রথম ক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়াবে- তোমরা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের মধ্যে যা কিছু দিয়েছেন- তোমাদের হাত-পা, চোখ, কান, মন-মস্তিষ্ক- সব কিছুই যেন ইসলামের ভিতর এবং আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়। এমন যেন না হয় যে, হাত-পা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তোমরা ইসলামের হুকুম-আহকাম পালন করে যাচ্ছ, অথচ তোমাদের মন-মস্তিষ্ক তাতে সন্তুষ্ট নয়। কিংবা মন-মস্তিষ্ক ইসলামের বিধি বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট। কিন্তু হাত পা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া কর্ম তার

٣٢- وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء -

৩২। তিনি গোটা মানব গোষ্ঠি ও জিন জাতির প্রতি সত্য জীবন ব্যবস্থা ও হিদায়াত এবং নূর ও আলো সহ প্রেরিত হয়েছেন।

বিরুদ্ধে ও বিপরীত।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থ হবে- তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের আলোই রয়েছে এর হুকুম-আহকাম। তোমরা ইসলামের কিছু বিধান মেনে নিলে। আর কিছু মানতে ইতস্তত করলে বা রাজি হলেনা-তা চলবেনা। সুতরাং ইসলামের এবং এর বিধানের সম্পর্ক বিশ্বাস ও ইবাদাতের সাথে হোক কিংবা ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবনের সাথে হোক, যেমন- আচার-অনুষ্ঠান, কাজ কারবার, লেন-দেন, চাকরী-বাকরী, শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, বিচার আদালত, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতির সাথেই হোক সব ব্যাপারে ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দিয়েছে, তোমরা তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

বস্তুত ইসলামের বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকাম মানব জীবনের যে কোন দিক ও বিভাগ সংক্রান্তই হোকনা কেন; যে পর্যন্ত তার সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রতি নিষ্ঠা সহকারে সত্যিকার ভাবে স্বীকৃতি না দেবে এবং বাস্তবে মেনে না চলবে সে পর্যন্ত মুসলমান হওয়ার যোগ্যতা কেউ অর্জন করতে পারবেনা।

আয়াতের শেষাংশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, জীবনের যে ক্ষেত্রেই ইসলামের বিধান মানা হলোনা, অন্য কিছু মানা হবে, সেটাই হবে শয়তানের বিধান এবং তখনই শয়তানের পদাংক অনুসরণ করা হবে। তা করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন।

ইসলামী জীবন যাপন থেকে তিন ভাবে মুখ ফিরানো হয়ে থাকে। বাধ্য হয়ে, প্রবৃত্তির তাড়নায় কিংবা অজ্ঞতা ও মূর্খতা বশতঃ। যেমন- ক. কেউ বাধ্য হয়ে মদ, সুদ বা শুকরের গোশত খেল, বা খ. প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে বা এর তাড়নায় কোন না জায়েজ কাজ করে বসলো কিংবা গ. গাফিলতির কারণে

٣٣- وأن القرآن كلام الله - منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا - وصدقه المؤمنون على ذلك حقا - وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة - ليس بمخلوق ككلام البرية - فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر - وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر - حيث قال تعالى : سَأُصْلِيهِ سَقَرَ - فلما أوعد الله بسقر لمن قال : إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (المدثر - ٢٥) علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولايشبه قول البشر -

তরজমাঃ

৩৩। নিশ্চয়ই কুরআন মজীদ আল্লাহর কালাম। আল্লাহ্ তায়ালা থেকেই বাণী হিসেবে কোনরূপ অবস্থা ও আকার আকৃতি ছাড়াই এর প্রকাশ ঘটেছে। আল্লাহ তায়ালা ওহী হিসেবে তাঁর রাসূল সাঃ এর উপর তা নাযিল করেছেন। মুমিনগণ এ হিসেবেই বরহক ওহী বলে কুরআনের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছে এবং প্রকৃতই যে এটি আল্লাহর কালাম, তার উপর দৃঢ় প্রত্যয় এনেছে। তবে এটি সৃষ্টি কুলের কথার মতো সৃষ্ট নয় (বরং আল্লাহর সৃষ্টিহীন বাণী এবং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত একটি গুণ।) সুতরাং কেউ এই কালাম শোনার পর যদি ধারনা করে যে, এটি মানুষের কথা, তবে সে নিঃসন্দেহে কাফের। আল্লাহ্ তায়ালা এরূপ লোকের নিন্দা করেছেন, তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং জাহান্নামের শাস্তির ধমক দিয়েছেন। যেমন বলেছেন, سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (আমি তাকে সত্তর জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (আল-মুদ্দাসির-২৬)। সুতরাং যে লোক বলবে – إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ – (এটি তো মানুষের কথা বৈ কিছুই নয়) আল মুদ্দাসসির-২৫) (তাকে যখন আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামে ছুড়ে মারার ধমক দিয়েছেন,) তখন নিশ্চিতভাবে আমাদের জানা হয়ে গেল এবং স্থির বিশ্বাস হল যে, নিশ্চয়ই কুরআন মজীদ মানুষের নয়, মানুষের স্রষ্টার কালাম এবং মানুষের কালামের সাথে এর কোন সাদৃশ্য নেই।

٣٤- ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر - فمن أبصر هذا اعتبر - وعن مثل قول الكفار انزجر - وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر -

৩৪। যে ব্যক্তি মানবীয় গুণাবলীর কোন গুণ দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালাকে বিশেষিত করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। (কারণ আল্লাহ তায়ালা নিজ সত্তায় ও গুণাবলীতে সৃষ্টি থেকে আলাদা) অতএব যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে কাজ করবে, সে শিক্ষা লাভে ধন্য হবে এবং কাফেরদের ন্যায় অবান্তর কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকবে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় গুণাবলীতে যে অনন্য, মনুষ্য সদৃশ নন-এই সন্দেহাতীত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে।

অজ্ঞতা বশতঃ নাপাক ময়লার স্তূপে তার পা ডুবে গেল। প্রথম অবস্থায় এরূপ কাজ পরিহার করার আপ্রাণ চেষ্টা করা ফরয, দ্বিতীয় অবস্থায় সাথে সাথে তাওবা করা ফরয। আর তৃতীয় অবস্থায় যথাশীঘ্র সম্ভব নিজকে নাপাক মুক্ত করা কর্তব্য। কিন্তু যদি সে ব্যক্তি মল-মূত্রের স্তূপের সংগে আপোষ করে ফেলে, সেই ময়লার স্তূপের উপর পাক-পবিত্র বিছানা-পত্র বিছিয়ে নেয়, বসবাস করতে থাকে, সন্তান জন্ম দেয়া শুরু করে, নামায রোযা যিকির ফিকিরে মগ্ন হয়ে যায় এবং নিজকে একজন খাঁটি মুসলমান বলে মনে মনে গৌরব বোধ করতে থাকে, তবে অবশ্যই সে ভুল করবে।

আল্লার বিধান মানুষের নিকট পৌঁছার একমাত্র মাধ্যম তাঁর রাসূল (সাঃ)। রাসূল (সাঃ) তাঁর কথা ও কাজে এই বিধানের বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়ে গেছেন। তিনি আল্লার আইনগত সার্বভৌমত্বের খলীফা বা প্রতিনিধি। তাঁর আনুগত্য হলেও আল্লারই আনুগত্য। রাসূল (সাঃ) এর আদেশ-নিষেধ ও ফয়সালাকে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই আন্তরিক ভাবে মেনে নিতে হবে। এটা আল্লারই নির্দেশ। অন্যথায় ঈমানের কোন অর্থই থাকবেনা।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

٣٥-والرؤية حق لاهل الجنة بغير احاطة ولاكيفية كما نطق به كتاب ربنا : وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ - (القيامة: ٢٢-٢٣)

৩৫। বেহেশত বাসীদের জন্য আল্লাহর দর্শনলাভ সত্য ও সঠিক। আর তা হবে সব রকম দিক, স্থান, বা সীমা পরিসীমার বিনা পরিবেষ্টনে এবং আমাদের বোধগম্য কোন অবস্থা, ধরণ বা আকৃতি ছাড়া। যেমন- আমাদের রব আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কিতাবে বলেছেন ঃ

وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ - اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ -

"সেদিন অনেক চেহারা হাসিখুসিতে উজ্জ্বল হবে, আপন পরোয়ার দিগারের দিকে দৃষ্টিমান থাকবে।" (আল-কিয়ামা- ২২-২৩)

لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

না, তোমার রবের কসম, তারা কখনো ঈমানদার হবেনা, যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট যাবতীয় বিরোধ বিবাদ ও সমস্যায় (হে নবী) তোমাকে ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেয়। অতঃপর তুমি যে ফয়সালা দিলে, তাতে নিজেদের অন্তরে কোন রূপ সংকীর্ণতা বোধ না করে এবং তা হৃষ্ট মনে (জীবনের সব ক্ষেত্রে) পুরোপুরি মেনে নেয়। (আন্-নিসা-৬৫)

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا - وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

অর্থঃ ঈমানদারদের কথা হচ্ছে একমাত্র এই যে, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহ্ ও রাসুলের দিকে ডাকা হয়, তখন তারা বলে: আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। এমন ব্যক্তিরাই সফল হবে। (আন-নুর-৫১)

وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال – ومعناه على ما أراد – لاندخل في ذلك متأولين بآرائنا – ولامتوهمين بأهوائنا – فانه ما سلم في دينه الا من سلّم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلي عالمه –

এই আয়াতের তাফসীর, আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা ও ইলম মুতাবিকই হবে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ্ হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে, তা যেভাবে তিনি বলেছেন সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে এবং এর যে অর্থ তিনি উদ্দেশ্য করেছেন, তা মেনে নিতে হবে। আমরা তাতে নিজস্ব রায় ও মতামতের ভিত্তিতে কোন অপব্যাখ্যার মাধ্যমে ও নিজেদের প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে অনুমানের ভিত্তিতে কোন মনগড়া অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটাবোনা। কেননা, দীনি ও ধর্মীয় ব্যাপারাদিতে কেবলমাত্র সে লোকই ভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে নিরাপদ থাকতে পারে, যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর নিকট নিজকে পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করে এবং যে সব বিষয় তার নিকট সংশয়যুক্ত-যিনি তা সম্যক জ্ঞাত আছেন-তাঁর কাছে ওসব বিষয় সোপর্দ করে।

উপরোক্ত আয়াতগুলো কেবল মাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদত বন্দেগী, আচার আচরণ বা অধিকারের কথাই বুঝায়নি। বরং আকীদা বিশ্বাস, চিন্তা চেতনা, দর্শন মতবাদ এবং রাজনীতি, অর্থনীতি বিচার প্রভৃতি বিষয়গুলোতেও তা ব্যাপ্ত। সুতরাং রাসূল সাঃ এর বর্তমানে যাবতীয় ব্যাপারে তাঁর নিকট এবং তাঁর অবর্তমানে তাঁর প্রবর্তিত শরীয়াতের নিকট মীমাংসা চাওয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। এসব ক্ষেত্রে রাসূল সাঃ এর সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে ঈমান ও কুফরের মানদন্ড সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এ মানদন্ড সাব্যস্ত করলে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কসম খেয়ে বলেছেন,

"কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন বা মুসলমান হতে পারে না, যতক্ষণ না সে সব বিষয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে ও প্রশান্ত মনে রাসূল সাঃ এর সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়।"

٣٦- ولا تثبت قدم الاسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام - فمن رام علم ما حظر عنه علمه - ولم يقنع بالتسليم فهمه وحجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافى المعرفة وصحيح الايمان - فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والاقرار والانكار - موسوسًا تائهًا شاكًّا زائغًا - لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدًا مكذبًا -

৩৬। (আল্লাহ্ ও রাসূলের) নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ, পরিপূর্ণ বশ্যতা ও ফরমা বরদারী ছাড়া কারো ইসলাম অটল-অবিচল ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত পারেনা। এ জন্য যে লোক এমন কোন ইলম -জ্ঞান অর্জনে চেষ্টিত হয় যা তার জ্ঞান-সীমার বাইরে অর্থাৎ যা থেকে তার জ্ঞান সীমিত এবং তার বুদ্ধি বিবেক ও বুঝ-সমঝ যদি আত্মসমর্পণের উপর তুষ্ট ও তৃপ্ত না হয় তবে তার এই ইচ্ছা ও বাসনা-কামনা তাকে খাঁটি তাওহীদ ও পরিচ্ছন্ন জ্ঞান এবং সঠিক ঈমান থেকে দূরে নিক্ষেপ করবে। তখন সে নানা রূপ অসওয়াসা, পেরেশানী ও সংশয়ের মধ্যে পড়ে কুফরী ও ঈমান, বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং স্বীকার-অস্বীকারের দ্বন্দ্বে পড়ে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকবে। না আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনবে, আর না দৃঢ় অবিশ্বাসী ও অস্বীকারী হবে।

টীকা ৩০-৩২

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আখেরী নবী। তাঁর পরে যদি কেউ নবুওয়াতী দাবী করে, তবে সে সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। সে নিজেও কাফের, যারা তাকে নবী স্বীকার করবে, তারাও কাফের। যেমন- এযুগে মির্জা গোলাম আহমদ নবুওয়াতী দাবী করেছে আর কাদিয়ানী সম্প্রদায় তার উপর ঈমান এনেছে। তাই মির্জা গোলাম ও কাদিয়ানীরা কাফের।

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ -

٣٧–ولايصح الايمان بالرؤية لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم – أوتأولها بفهم – اذكان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف الى الربوبية – بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين – ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه – فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية – منعوت بنعوت الفردانية – ليس في معناه احد من البرية –

৩৭। জান্নাত বাসীদের জন্য আল্লাহর দীদার (দর্শন) প্রমাণিত সত্য। এবিষয়ে যে লোক এটাকে ধারনা কল্পনার বিষয় মনে করে কিংবা নিজ জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী এর (মনগড়া) তাবীল (ব্যাখ্যা) করে, তার ঈমান সহীহ ও বিশুদ্ধ হবে না। কেননা, আল্লাহর দীদারের এবং রুবুবিয়াত সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ের মর্মার্থের কোন রূপ অপব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকা এবং বাধ্যতামূলক, ভাবে একথার সত্যতা মেনে নেয়াই ঈমানের পরিচায়ক। এই নীতির উপরেই মুসলমানদের আসল দীন প্রতিষ্ঠিত। আর যে লোক আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলী অস্বীকার করা এবং সৃষ্টির সাথে আল্লার গুণাবলীর সাদৃশ্য খোঁজা ও তুলনা দেয়া থেকে আত্মরক্ষা না করবে অবশ্যই তার পদস্খলন ঘটবে। এবং সে রাব্বুল আলামীনের অনাবিল ও নিষ্কলুষ পবিত্রতা ও মর্যাদা বুঝতে ব্যর্থ হবে। কারণ, আল্লাহ্ তায়ালা ওয়াহদানিয়াতের গুণাবলী দ্বারা বিশেষিত এবং অনন্য বিশেষণে বিভূষিত। সৃষ্টি লোকের কেউ তাঁরগুণে গুনান্বিত নয়।

'বরং (মুহাম্মাদ সাঃ) আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।' (আল-আহযাব-৪০)

অর্থাৎ তাঁর পরে কোন রাসূল তো দূরের কথা, কোন নবীও আর আসবেন না।

ক. রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ختم بى النبيون –
আমার দ্বারা নবীগণের ধারা পূর্ণ ও শেষ করে দেয়া হয়েছে। (মুসলিম, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

٢٨–وتعالى عن الحدود والغايات والاركان والاعضاء والأدوات – لاتحويه الجهات الستة كسائر المبتدعات –

তরজমাঃ

৩৮। আল্লাহ্ তায়ালা সব রকম সীমা-পরিসীমা ও দিক-দিগন্ত থেকে, অংগ-প্রত্যঙ্গ এবং নানা উপাদান ও উপায়-উপকরণ থেকে অনেক উর্ধ্বে। অন্যান্য যাবতীয় উদ্ভাবিত সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ছয় দিক তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الاَنْبِيَاءُ – كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ – وَاَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ –

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব করতেন নবী গণ। একজন নবী মারা গেলে অপর একনবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর কোন নবী হবে না। তবে অনেক খলীফা হবে। (বুখারী)

قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فَاَحْسَنَهُ واجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة – فانا اللبنة وانا خاتم النبيين –

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত হলো এরূপ- যেমন এক ব্যক্তি একটি ভবন বানালো এবং খুবই সুন্দর ও কারুময় করে নির্মাণ করলো। কিন্তু এক কোণে একখানি ইটের জায়গা খালি রেখে দিল। লোকজন এই ভবনের চারদিকে ঘুরতো, এর সৌন্দর্য ও কারুকার্য দেখে বিস্ময় ও মুগ্ধতা প্রকাশ করতো এবং বলতো, এখানে এই ইটখানি লাগানো হয়নি কেন? জেনে রেখো, আমিই হলাম সে ইটখানি এবং আমিই সর্বশেষ নবী। (বুখারী)

٣٩- والمعراج حق وقد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بسخمه في اليقظجة إلى السماء - ثم الى حيث شاء الله من العلا - واكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى : مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ مارأى = فصلى الله عليه وسلم فى الأخرة والأولى -

তরজমাঃ

৩৯। মি'রাজের ঘটনা সত্য। নবী করীম (সাঃ) কে রাতে রাতেই জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে এই ভ্রমণ করানো হয়েছিল এবং আসমানে তুলে নেয়া হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা যত ঊর্ধ্ব জগতে চেয়েছেন, তাঁকে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁকে যে মান-মর্যাদায় ভূষিত করতে চেয়েছেন, ভূষিত করেছেন এবং তাঁর এই একান্ত প্রিয় বান্দার প্রতি যা ওহী করার ছিল করেছেন।

مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ مارأى- (নবীর) দৃষ্টি যা কিছু দেখেছে, অন্তর তার সত্যতা স্বীকার করেছে। (অর্থাৎ সত্য বলে সায় দিয়েছে)। আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়া-আখিরাতে তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

এর মানে, আমার আগমনে নবুওয়াতের প্রাসাদটি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এখন আর কোন স্থান খালি নেই, যা পূর্ণ করার জন্য নবী আসার প্রয়োজন হতে পারে।

মুসলিম শরীফে শেষ নবী সংক্রান্ত অনেক হাদীস আছে। একটির শেষাংশে হলো-

فَجِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ -

'অতঃপর আমি এসেছি। সুতরাং আমি নবী আগমনের ধারাকে শেষ করে দিয়েছি।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت - فلا رسول بعدى ولانبى -

'রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, রিসালাত ও নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা শেষ ও পরিসমাপ্ত হয়ে গেছে। আমার পর এখন না কোন রাসূল আসবে, না কোন নবী।' তিরমিযি।

٤٠- والحوض الذى اكرمه الله تعالى به غياثا لامته حق-

তরজমাঃ

৪০। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মাতকে সুপেয় শরবত পানে পিপাসা দূর করার জন্য তাঁকে যে হাউযে কাউসার দানে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য।

عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .... وانه سيكون فى امتى كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم النبيين - لانبى بعدى -

সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, ...

আরও জেনে রেখো যে, আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন চরম মিথ্যাবাদী আসবে। এদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে মনে করবে ও দাবী করবে। অথচ আমিই শেষ নবী। আমার পর আর কোন নবী নেই। (আবুদাউদ)

এভাবে সমস্ত হাদীসের কিতাবে অসংখ্য বার হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ই শেষ নবী, তাঁর পর আর কোন নবী নেই, বলে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, তাঁর পর যারাই এ দাবী করবে, তারা দাজ্জাল ও চরম মিথ্যাবাদী।

কুরআন-হাদীসের পর সাহাবায়ে কিরামের ইজমা এবং ঐক্যবদ্ধ মত রয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) এর পর আর কোন নবী বা রাসূল নেই। তিনিই শেষ নবী। একই রূপ ইজমা রয়েছে সমস্ত ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, অলী-বুজুর্গ ও গোটা মুসলিম উম্মাহর। এ ব্যাপারে কারো কোন মতভেদ নেই।

অতএব এটা প্রমাণিত সত্য যে, কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ই শেষ নবী ও রাসূল। যারাই এখন নবী হওয়ার দাবী করবে তারা চরম মিথ্যাবাদী ও কাফের। যারা এরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে নবী বলে বিশ্বাস করবে তারাও কাফের। তাই কাদিয়ানীরাও সুস্পষ্ট গোমরাহ্ ও কাফের।

٤١- والشفاعة التى ادخرها لهم حق - كما روى فى الاخبار -

٤٢- والميثاق الذى اخذه الله تعالى من ادم وذريته حق -

তরজমাঃ

৪১। আল্লাহ্ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মদিয়ার জন্য শাফায়াতের যে ব্যবস্থা সংরক্ষিত করে রেখেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য। যেমন অনেক হাদীসে তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

৪২। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) ও বনী আদম থেকে (রূহের জগতে তাঁর রবুবিয়াত সম্পর্কে) যে অংগীকার নিয়েছিলেন তা সত্য।

টীকাঃ

৩৩. কুরআনের প্রতি ঈমান- আল্লাহ্ তায়ালা রাসূল (সাঃ) এর সাথে কুরআনও পাঠিয়েছেন। এটা তাঁর কালাম, তাঁর কিতাব। এটা কোন মন্ত্রের বই নয়। এটা এমন কিতাব দুনিয়ায় যার মাধ্যমে এক মহাবিপ্লব সাধিত হয়েছে। যা সব চেয়ে বড়, সর্বোত্তম ও সর্বাধিক সৎ বিপ্লব সাধন করে ছেড়েছে। এ কিতাব জাতির উত্থান-পতনের মানদন্ড। দুনিয়ার সর্ব নিকৃষ্ট আরব জাতিকে তা দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছে। দুনিয়ার পতিত জাতিকে দুনিয়ার নেতা বানিয়েছে। যারা ছিল উট ও ছাগলের রাখাল, যাদের হাতে ছিল উট ও ছাগলের রশি, তাদের হাত থেকে তা নিয়ে সেই হাতে এই কিতাব তুলে দিয়েছে দুনিয়ার জাতিসমূহের নেতৃত্বের বাগডোর। তাদেরকে বানিয়ে দিয়েছে দুনিয়ার সেরা শক্তি, অপরাজিত বাহিনী এবং অতুলনীয় পরিচালক।

এ কিতাব প্রত্যেক মুসলমানের জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের জন্য হেদায়েত ও দিশারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছে। এটা আল্লাহর ফরমান। মুসলিম উম্মাহর পবিত্র সংবিধান। এটি মানা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। এ কিতাবকে জানা, এর উপর ঈমান আনা, এটি মেনে চলা, এর ইলম ও আমলকে

٤٢- وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة - فلا يزاد فى ذلك العدد ولاينقص منه -

তরজমাঃ

৪৩। কত লোক জান্নাতে যাবে এবং কত লোক জাহান্নামে যাবে অনাদি কালেই আল্লাহ তায়ালা সামগ্রিক ভাবে তার পরিসংখ্যান জানতেন। এ সংখ্যা আর বাড়বেওনা এবং কমবেওনা।

পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেয়া, এর জন্য জান-মাল কুরবান করা, মাথা দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেলেও এই কুরআন থেকে আলাদা হতে রাজি না হওয়া আমাদের ফরয এবং তা এই কিতাবের হক ও অধিকার। এটাই উম্মাহর সর্বসম্মত রায়। মুসলমানদের সম্পর্ক রক্ত, বর্ণ, ভাষা, মাটির কারণে, নয়। বরং এই কিতাবের কারণে। যারা এই কিতাব মানে তারা আমাদের এবং আমরা তাদের। যারা তা মানেনা তারা আমাদের নয় এবং আমরাও তাদের নই, তা যে কেউ হোকনা কেন।

গোটা কুরআনের উপর ঈমান আনা এবং তা মানা আমাদের উপর ফরয। এর কোন একটি জিনিস অস্বীকার করা গোটা কুরআন অস্বীকার করার সমতুল্য। এখানে শতকরা দশ, পঞ্চাশ ভাগ- যতটা মানবে- আল্লাহ্ ততটা তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন- এমন কোন বিধান নেই। বরং মানলে পুরোটা মানতে হবে। আংশিক মানা ও আংশিক অস্বীকারের অবকাশ এ কিতাবে নেই। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর আমলে একদল মুসলমান সব মানতে রাযি, কেবল যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শে বসলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, যদি তারা জাকাতের বকরীর একটি বাচ্চা দিতেও অস্বীকার করে, তবে তাদের সাথে আমি যুদ্ধ করব। কেউ না গেলে আমি একাই লড়বো। সব সাহাবী তাঁর সাথে একমত হলেন। এটা সাহাবাদের ইজমা। লড়াই করে তাদের

٤٤- وكذلك افعالهم فيما علم منهم ان يفعلوه - وكل ميسر لما خلق له - والاعمال بالخواتيم - والسعيد من سعد بقضاء الله - والشقي من شقي بقضاء الله -

তরজমাঃ

৪৪। অনুরূপ ভাবে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সব ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে পূর্ব হতেই পূর্ণ অবহিত আছেন। যে কাজের জন্য যে লোককে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার জন্য সহজ করে দেয়া হয়। আর সব কাজের ফলাফল শেষ পরিণতির উপর নির্ভরশীল। সে ব্যক্তিই প্রকৃত সৌভাগ্যবান, আল্লাহ্ তায়ালার ফয়সালা অনুযায়ী (আখিরাতে) যে লোক সৌভাগ্য বান রূপে প্রমাণিত হবে। আর দুর্ভাগা হলো সে লোক, আল্লাহ্ তায়ালার বিচারে যে বদবখত রূপে সাব্যস্ত হবে।

দমন করা হলো এবং যাকাত দিতে রাযি করানো হলো। তাই কুরআনের আইন মানা না মানার ব্যাপারে কোনরূপ ভাগাভাগি করা যাবেনা। কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করা যাবেনা।

আল্লাহ, রাসূল (সাঃ), দীন ইসলাম ও কুরআনকে এভাবে মানা ফরয। বাতেলের অধীনে পুরো কুরআন মানা অসম্ভব। তাই এমন একটি ভূখণ্ড ও সমাজ প্রয়োজন-যেখানে আল্লাহ হবেন সার্বভৌম শক্তি, কুরআন হবে আইন, রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ হবে আদর্শ, কুরআন-সুন্নার পারদর্শী ও অনুসারী এবং সৎ, যোগ্য মুত্তাকীরা হবেন নেতৃত্বের আসনে আসীন, ইসলাম হবে বিজয়ী, সেখানেই কেবল জীবনের সব ক্ষেত্রে পরিপূর্ণরূপে ইসলাম মেনে চলা সম্ভব। এমন সমাজ যদি না থাকে, তবে সেরূপ সমাজ গড়ার জন্য প্রয়োজন এমন একটি জামায়াতের এবং সত্যনিষ্ঠ কর্মী বাহিনীর যারা ইসলামের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে রাজি। তাদের চেষ্টা, সাধনা ও ত্যাগের পেছনে লক্ষ্য থাকবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এরূপ চেষ্টা সাধনার নামই হল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ-আল্লাহর পথে জিহাদ।

এটিই ছিল রাসূল (সাঃ) এর তরীকা এবং সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ।

٤٥ - واصل القدر سر الله تعالى فى خلقه - لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولانبى مرسل - والتعمق والنظر فى ذلك ذريعة للخذلان - وسلم الحرمان ودرجة الطغيان - فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة - فان الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه - ونهاهم عن مرامه - كما قال تعالى فى كتابه : لَا يُسْـئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ - (الانبياء - ٢٣) فمن سال لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب - ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين -

তরজমাঃ

৪৫। তাকদীরের মূল কথা হলো, মাখলুক বা সৃষ্টির ব্যাপারে এটি আল্লাহ্ তায়ালার একান্ত গোপন বিষয়। না ঘনিষ্ঠতম কোন ফেরেশতা তা জানেন, না কোন নবী-রাসূল তা জানতেন। এ ব্যাপারে গভীর ভাবে তলিয়ে দেখা বা তত্ত্বানুসন্ধান ও চিন্তা-গবেষণার পরিণতি হল অবমাননা ও লাঞ্ছনার হেতু, বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের কারণ এবং খোদাদ্রোহিতা ও সীমালংঘনের স্তর। সুতরাং এ ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণায় লিপ্ত হওয়া থেকে এবং যে কোন অস্‌ওয়াসা হতে পুরোপুরি সতর্ক থাকা ও আত্মরক্ষা করা উচিত। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালা তাকদীর সংক্রান্ত জ্ঞান তাঁর সৃষ্টিলোক থেকে সম্পূর্ণ গোপন রেখেছেন এবং মাখলুককে এর তত্ত্ব ও মূল রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করতে বারণ করেছেন। যেমন, তিনি কুরআন মজীদে বলেছেন,

---

কুরআনের উপর ঈমান আনার মর্মার্থও তাই।

এ কথাগুলোর দলীল হিসেবে বলা যায় ঃ

হযরত সুহাইব রুমী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

مَا آمَنَ بِالْقُرْاٰنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ -

অর্থাৎ কুরআনের হারাম করা জিনিসকে যেলোক হালাল করে নিয়েছে সে কুরআনের প্রতি ঈমান আনেনি। (তিরমিযী)

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ - (الانبياء - ٢٣)

'তিনি যা করেন, সে জন্য তাঁকে (কারো সামনে) জবাবদিহি করতে হয়না এবং অন্য সকলকেই জবাবদিহি করতে হবে।' (আল-আম্বিয়া-২৩)

এখন কেউ যদি এই প্রশ্ন করে বসে যে, আল্লাহ্ তায়ালা একাজ কেন করলেন? তখন সে আল্লার কিতাবের হুকুম রদ করে দিল এবং নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলো। আর যে লোক কুরআনের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে সে কাফের হয়ে যায়।

يَقْرَئُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ - يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ -

তারা কুরআন পাঠ করে। কিন্তু কুরআন তাদের গলার নিচে নামেনা। তারা দীন ইসলাম থেকে এমন ভাবে বেরিয়ে যায়, যেমন ভাবে তীর ধনুক হতে ছিটকে পড়ে। (বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা)

টীকা ঃ

৩৫। আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী نظر পদটি যখন فى অব্যয় দ্বারা متعدى হয়। তখন তার অর্থ হয় চিন্তা-গবেষণা ও শিক্ষা গ্রহণ করা। আর যদি الى দ্বারা হয়, তবে তার অর্থ হয় চর্মচক্ষে দর্শন করা। উদ্ধৃত আয়াতে الى এসেছে তাই এখানে স্বচক্ষে দেখাই অর্থ হবে।

আখেরাতে আল্লাহ্ তায়ালাকে দেখা সম্পর্কে ত্রিশ জন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ সংক্রান্ত হাদীস মুতাওয়াত্তির এর স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ نَاسًا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ - قَالُوْا لَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ - قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِى الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ ؟ قَالُوْا

٤٦- فهذا جملة ما يحتاج اليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى - وهى درجة الراسخين فى العلم - لأن العلم علمان : علم فى الخلق موجود - وعلم فى الخلق مفقود - فانكار العلم الموجود كفر - وادعاء العلم المفقود كفر - ولايثبت الايمان إلابقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود -

তরজমাঃ ৪৬। এ হলো ইসলামী আকীদার সার কথা; যার মুখাপেক্ষী হলেন আল্লাহ্ তায়ালার রওশন দিল আউলিয়াগণ। এটাই হল রাসেখীন ফিল ইলম-অর্থাৎ পাকা-পোক্ত জ্ঞানবানদের জ্ঞানের স্তর। কেননা, ইলম দু'রকমঃ ক. এমন ইলম, যা মানুষের মাঝে বিদ্যমান আছে। (রাসূল সাঃ যা নিয়ে এসেছেন অর্থাৎ শরীয়াতের ইলম)। খ. এমন ইলম, যা মানুষের মধ্যে নেই। অর্থাৎ অবিদ্যমান ইলম। (যেমন তাকদীর সংক্রান্ত ইলম ও গায়েবী ইলম)। সুতরাং বিদ্যমান ইলম অস্বীকার করা কুফরী। আর অবিদ্যমান ইলম-এর দাবি করাও কুফরী। এই বিদ্যমান ইলমকে মেনে নিলে এবং অবিদ্যমান ইলম অনুসন্ধান ও অন্বেষণ পরিহার করলেই কেবল ঈমান সহীহ, সঠিক ও শুদ্ধ বলে প্রমাণিত হবে।

---

٧ - قَالَ : اِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ -

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদল লোক (রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে) জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লার রাসূল, কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাবো? তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, পূর্ণিমার রাত্রে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বললো, না, হে রাসূলুল্লাহ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, মেঘে আচ্ছন্ন না থাকলে সূর্যে কি অসুবিধা হয়? তারা বললো, না। তখন তিনি বললেন, তোমরাও আল্লাহকে এরূপই দেখবে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, আহমাদ) সূরা ইউনুসের

٤٧– ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم– فلواجتمع الخلق كلهم على شئ كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه– ولواجتمعوا كلهم على شئ لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنًا لم يقدروا عليه – جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة– وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه –

তরজমাঃ

৪৭। আমরা 'লাওহ্' ও 'কলম' এবং লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ সব কিছুর উপর ঈমান রাখি।

আল্লাহ্ তায়ালা লাওহে মাহফুজে যা হবে বলে লিখেদিয়েছেন, সমগ্র সৃষ্টি মিলেও যদি তা হতে না দেয়ার চেষ্টা করে, কখনো তারা এরূপ করতে সমর্থহবেনা। আর যে বিষয়ে তিনি কিছু লিখেননি অর্থাৎ যা হবে না বলে তিনি লিখে দিয়েছেন, গোটা সৃষ্টি মিলেও যদি তা করতে চায়, তা করার সাধ্য কখনো হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হওয়ার, তা সবই চূড়ান্তভাবে লিখা হয়ে গেছে। মানুষ যা পায়নি, তা পাওয়ার ছিলনা বলেই পায়নি। আর যা পেয়েছে, তার অন্যথা হওয়ার ছিল না বলেই পেয়েছে।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ – ٢٦

(যারা ভাল কাজের নীতি অবলম্বন করলো, তাদের জন্য ভাল ফল রয়েছে, এবং আরো অধিকও।) এখানে 'আরো অধিক' দ্বারা রাসূল (সাঃ) আখেরাতে আল্লাহ্ কে দেখার কথাই বলেছেন। (মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযি, ইবনে মাজা)

সূরা ক্বাফ-এ وَلَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ – ٣٥

এই আয়াতে 'এবং আমার নিকট রয়েছে আরো অধিক' এর ব্যাখ্যায়ও দীদারে এলাহীর কথাই বলা হয়েছে। (তাফসীরে তাবারী)

٤٨- وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه - فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما - ليس فيه ناقض ولامعقب ولامزيل ولامغير - ولامحول ولاناقص ولازائد من خلقه في سمواته وارضه - وذلك من عقد الايمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته - كما قال تعالى في كتابه : وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا - (الفرقان - ٢) وقال تعالى : وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا - (الاحزاب - ٣٨) فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما - لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما - وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما -

তরজমাঃ

৪৮। মানুষের এ বিষয়টিও জানা ও বিশ্বাস করা কর্তব্য যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি জিনিস সম্পর্কেই পূর্ব থেকে পূর্ণ অবগত আছেন। এ জন্যেই তিনি তা সুদৃঢ়ভাবে ও অকাট্য তাকদীর হিসেবে লিপিবদ্ধ ও নির্ধারণ করে রেখেছেন। আসমান-যমীনের কোন মাখলুকই তা নাকচ করতে পারবেনা, মুলতবী করতে সক্ষম হবেনা, বিলুপ্ত বা পরিবর্তন করতে পারবেনা, রূপান্তর ও অবস্থান্তর করতে পারবেনা, তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে পারবেনা। আর এটাই হচ্ছে ঈমানের মূল ভিত্তি মারেফাত বা খোদা পরিচিতির মৌলিক নীতিমালা এবং আল্লার একত্ব ও রবুবিয়াতের প্রকৃত স্বীকৃতি আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করছেন ঃ

টীকা ঃ৩৯। মি'রাজের ঘটনাকে দু'স্তরে ভাগ করা যায়। খানা কা'বা থেকে বায়তুল মাক্‌দিসের মসজিদে আক্‌সা পর্যন্ত প্রথম স্তর। কুরআন বলছে-

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ - لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا -

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا – (الفرقان – ٢)

'এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে যথাযথ পরিমাপের উপর রেখেছেন। (আল-ফুরকান-২)

এবং আল্লাহ্ তায়ালা এ-ও বলেছেন,

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا (الاحزاب – ٣٨)

"আর আল্লার বিধান অকাট্য ও সুনির্ধারিত থাকে।"

সুতরাং যে ব্যক্তি তাকদীরের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়, তাঁর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় এবং বিকার গ্রস্ত অন্তর নিয়ে তাকদীরের রহস্য ও তত্ত্বানুসন্ধানে লিপ্ত হয়, তার ধ্বংস অবধারিত। কারণ, সে ব্যক্তি নিজের ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতেই গায়েবের এক গোপন রহস্য জানার অপচেষ্টা করে আর এ ব্যাপারে সে অসঙ্গত ও অবাস্তব কথা বলে নিজেকে জঘন্য মিথ্যুক ও পাপিষ্ঠে পরিণত করে।

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ – (بني اسرائيل – ١)

তরজমা ঃ- পবিত্র তিনি, যিনি রাত্রের সামান্য সময়ে তাঁর বান্দাহ্‌কে মসজিদে হারাম থেকে দূরবর্তী সেই মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, যার চার পাশকে তিনি বরকত দান করেছেন- যেন তাকে নিজের কিছু নিদর্শনাদি পর্যবেক্ষণ করাতে পারেন। নিশ্চয় তিনি সব দেখেন ও শোনেন। (বনী-ইসরাঈল-১)

এ স্তরের নাম ইস্‌রা। এটা হয়েছে সশরীরে। কেননা, দেহ ও রুহের সমষ্টিকেই 'আবদ' বা বান্দাহ্ বলা হয়। এ ঘোষণা কোরআনের। মিরাজের এ অংশ অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে।

মসজিদে আকসায় তিনি ইমামতি করেন, সব নবী তাঁর পেছনে নামায পড়েন। পরে তিনি ঊর্ধ্ব জগতে ভিন্ন ভিন্ন স্তর অতিক্রম করে অবশেষে আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে হাযির হন, তাঁর সাথে কথা বলেন এবং নানা গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত লাভ করেন। সেখান থেকে রাতে রাতেই আবার বায়তুল মাকদেস হয়ে

٤٩– والعرش والكرسي حق –

٥٠– وهو مستغن عن العرش ومادونه –

٥١– محيط بكل شيء وفوقه – وقد اعجز عن الاحاطة خلقه –

তরজমাঃ

৪৯। আল্লাহ্ তায়ালার আরশ ও কুরসী সত্য। যেমন, তিনি কুরআনে তা বর্ণনা করেছেন।

৫০। তবে আল্লাহ্ তায়ালা আরশ এবং অন্য কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন।

৫১। সব কিছুই আল্লাহ্ তায়ালা পরিবেষ্টন করে আছেন। সবই তার আওতাধীন ও আয়ত্তাধীন, তবে তিনি স্বয়ং এসবের উর্ধ্বে এবং সৃষ্টি জগত তাঁকে আয়ত্ত করতে পারবেনা।

মসজিদে হারামে ফিরে আসেন। এ স্তরের নাম মি'রাজ।

ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে ২৫জন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। এসব হাদীস মুতাওয়াতির স্তর পর্যন্ত পৌছেছে। মি'রাজের বিস্তারিত বিবরণ তাতেই পাওয়া যায়। ইমাম ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে বলেন- ইসরা সম্পর্কে সব মুসলমানের ঐকামত্ত রয়েছে। কেবল ধর্মদ্রোহী-যিন্দিকরা তা মানতে অস্বীকার করেছে।

মি'রাজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দেয়া হয়। পরপরই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত চৌদ্দটি মুলনীতি নাযিল করা হয়। সূরা বনী ইসরাইলের ২৩ নম্বর আয়াত থেকে ৪০ নম্বর আয়াতে এসব মুলনীতির বর্ণনা করা হয়েছে।

টীকা ঃ

৪০। পঞ্চাশ এর অধিক সাহাবী হাওযে কাউসার সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ সংক্রান্ত হাদীস মুতাওয়াতির পর্যায় পর্যন্ত পৌছেছে।

নবী (সাঃ) বলেছেন, এই হাওয কিয়ামতের দিন তাঁকে দেয়া হবে।

٥٢- ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً- وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما -

তরজমা ঃ

৫২। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো, আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে তাঁর খলীল (বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করেছেন।। এবং হযরত মুসা (আঃ) এর সাথে কথা বলেছেন। এটাই আমাদের ঈমান, স্বীকৃতি ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

কিয়ামতের কঠিন সময় চারদিকে মানুষ 'পিপাসা' 'পিপাসা' বলে চীৎকার করতে থাকবে। তখন তাঁর উম্মাত এখানে হাযির হবে। তা থেকে পানীয় পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করবে।

أنا فرطكم على الحوض -

আমি তোমাদের সকলের আগেই হাওযের নিকট উপস্থিত থাকব। (বুখারী)

টীকা ঃ-

৪৬। অবিদ্যমান ইলম বলতে এখানে ইমাম তাহাবী (রঃ) গায়েবী ইলম বুঝিয়েছেন। গায়েবী ইলম একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। যেসব মানুষ গায়েবী জানে-বলে দাবি করে, তারা কাফের। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو -

তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবিগুলো রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত আর কেউ জানেনা। (আল-আনআম- ৫৯)

قل لا يعلم من في السموت والأرض الغيب إلا الله -

হে নবী, আপনি বলে দিন আল্লাহ্ ব্যতীত নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে কেউ গায়েবের খবর জানেনা। (আন-নমল-৬৫)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, গায়েবের চাবি হলো পাঁচটি। এগুলো আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানেনা। এরপর রাসূল (সাঃ) আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করলেন ঃ

৫২- ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين - ونشهد أنهم كانوا على الحق -

তরজমাঃ

৫৩। আমরা ফেরেশতাদের প্রতি, নবী-রাসূলগণের উপর এবং রাসূলগণের নিকট নাযিলকৃত আসমানী কিতাব সমূহের উপর ঈমান রাখি। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, নবী রাসূলগণ সবাই সুস্পষ্ট হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ - وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا - وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ - إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ -

"নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানেনা আগামী কাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্যু বরণ করবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, তিনি সব খবর রাখেন।" (লুকমান-৩৪)

আমাদের নবী (সাঃ) সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, নবী-রাসূলগণের নেতা, তিনিও গায়েব জানেন না। অন্যরা তো জানতেই পারেনা। আমাদের নবী (সাঃ) কে আল্লাহ্ তায়ালা গায়েব সম্পর্কে যতটুকু জানিয়েছেন, তার বাইরে তিনি কিছুই জ্ঞাত নন। কুরআন-সুন্নায় এর ভুরি ভুরি দলীল প্রমাণ রয়েছে।

গায়েব বলে বুঝানো হয়েছে, যেসব বিষয় এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি কিংবা অস্তিত্ব লাভ করলেও কোন সৃষ্টজীব সে সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারিনি।

আল্লাহ তাআলা যদি তাঁর কোন প্রিয় বান্দাকে গায়েবের কিছু জানিয়ে দেন, তবে তাকে 'গায়েব জানা' বলা হয়না। তেমনি কোন উপকরণ ও যন্ত্রাদির মাধ্যমে কোন অজানা কিছু জানাকেও গায়েব জানা বলা যায় না।

টীকা :-

৫৪। তাওহীদ বাদী এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোন মুসলমানকে কোন কবীরা গুনাহ করে ফেলার কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কাফের

٥٤- ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين - مادا موا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين - وله بكل ماقاله وأخبر مصدقين -

তরজমাঃ

৫৪। আমরা সব আহ্‌লে কিবলা অর্থাৎ যারা আমাদের কিবলার অনুসারী, তাদের কে ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন-মুসলমান বলে আখ্যায়িত করব যতক্ষণ তারা রসূল (সাঃ) যে শরীয়াত নিয়ে এসেছেন তা স্বীকার করবে এবং তাঁর প্রতিটি কথা ও খবর কে সত্য বলে মানবে।

ফতোয়া দেয়না। যেমন, জেনা করা, মদ পান, ঘুষ খাওয়া, লেনদেনে ত্রুটি বা মা-বাপের নাফরমানী এবং এ জাতীয় গুনাহে পতিত হওয়া। যতক্ষণ সে লোক গুনাহকে বৈধ মনে না করবে। যদি কেউ এ জাতীয় কোন গুনাহকে বৈধ ও হালাল মনে করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর গুনাহকে হারাম মনে করে তাতে পতিত হলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে সে কাফের হবে না, দুর্বল ঈমানদার হবে। শরীয়তের বিধান মুতাবিক শাস্তি ও দন্ড পাবে। কিন্তু খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায় এবং তাদের মত বাতিল মতাবলম্বীরা এ মতের বিরোধী। খারেজীদের মতে কবীরা গুনাহগার কাফের হয়ে যায়। মু'তাযিলাদের মতে, দুনিয়াতে সে মুসলমানও থাকেনা, কাফেরও হয়না। তবে আখিরাতে সে চিরকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। খারেজীরাও আখিরাতের ব্যাপারে মু'তাযিলাদের ন্যায় একইমত পোষণ করে। কুরআন-সুন্নাহ্ ও ইজমার আলোকে এ দু'সম্প্রদায়ের মতই বাতিল।

টীকা ঃ- ৬১। এই সংক্ষিপ্ত উক্তিতে কিছু কথা আছে। একজন কাফের কালেমা শাহাদাত পড়ে মুসলমান হয়। পরে যদি সে এমন কিছু করে, যাতে অপরিহার্যভাবে কাফের হয়ে যায়, তখন আবার তওবা করলে পুনরায় সে মুসলমান হয়ে যায়। যা কিছু স্বীকার করলে একজন কাফের মুসলমান হয়, তা অস্বীকার না করে অন্য অনেক কারণেও একজন মুসলমান কাফের হয়ে যেতে পারে। যেমন, ইসলাম বা নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি কুৎসা ও দোষ আরোপ করা, আল্লাহ্, রাসূল (সাঃ), কুরআন মজীদ কিংবা আল্লাহর কোন বিধানের প্রতি

٥٥- ولانخوض فى الله ولانمارى فى دين الله -

٥٦- ولانجادل فى القران - ونشهد إنه كلام رب العالمين - نزل به الروح الامين - فعلمه سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه وسلم - وهو كلام الله تعالى - لايساويه شئ من كلام المخلوقين - ولانقول بخلقه - ولانخالف جماعة المسلمين -

তরজমাঃ

৫৫। আমরা আল্লাহ্ তায়ালার জাত বা সত্তার ব্যাপারে অহেতুক গবেষণা করি না এবং তাঁর দীন ইসলাম সম্পর্কে হকপন্থী ও সত্যানুসারীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হইনা।

৫৬। আমরা কুরআন মজীদ সম্পর্কেও (বিভ্রান্তদের সাথে এর অর্থ, শব্দ ও পাঠ নিয়ে) বাদানুবাদ করিনা। বরং আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় এটি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কালাম। রুহুল আমীন অর্থাৎ হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তা নিয়ে এসেছেন এবং নবী-রাসূলদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে তা শিক্ষা দিয়েছেন। এটি আল্লাহ্ তায়ালার কালাম। গোটা মাখলুকের কারো কোন কথাই এর মত হতে পারেনা। কুরআনকে আমরা মাখলুক বা সৃষ্টি বলিনা। এবং এ আকীদা পোষণকারী মুসলিম জামায়াতের বিরুদ্ধাচারণ করিনা।

ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও উপহাস করা প্রভৃতি। এর দলীল হিসেবে উল্লেখ করা যায় আল্লাহ্ তায়ালার বাণী :

قُلْ أَبِاللَّهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ - لَاتَعْتَذِرُوْا - قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ -

"হে নবী, আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা করোনা। তোমরা কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর।" (সূরা

٥٧- ولانكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله -

٥٨- ولانقول لايضر مع الايمان ذنب لمن عمله -

٥٩- نرجو للمحسنين من المؤمنين ان يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته - ولانأمن عليهم ولانشهد لهم بالجنة - ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولانقنطهم -

তরজমাঃ

৫৭। আমাদের কিবলার অনুসারী কোন মুসলমান থেকে যদি কোন গুনাহের কাজ ঘটে যায়, তবে তাকে আমরা কাফের বলিনা, যতক্ষণ সে ওই গুনাহের কাজটিকে হালাল ও জায়েজ মনে না করে।

৫৮। আমরা একথাও বলিনা যে, ঈমান থাকা অবস্থায় যদি কোন লোক কোন গুনাহ করে ফেলে, তাতে তার কোনই ক্ষতি হয়না।

৫৯। আমরা আশা করি, নেক, মুমিন, মুহসিন, বান্দাদের গুনাহ খাতা আল্লাহ্ তায়ালা মাফ করে দেবেন এবং তাঁর রহমতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তবে আমরা তাদের ব্যাপারে আশংকা মুক্ত নই এবং তাদের বেহেশতী হওয়ার পক্ষে কোন সাক্ষ্যও দিইনা। অনুরূপ ভাবে গুনাহ্গার মুসলমানদের জন্য আমরা মাগফিরাত কামনা করি এবং তাদের সম্পর্কে আশংকা বোধও করি। তবে তাদেরকে মাগফিরাত লাভ ও ক্ষমা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশও করি না।

আত-তাওবা, ৬৫-৬৬)

আরও যেমন- মূর্তি বা প্রতীমা পূজা করা, মৃত ব্যক্তিদেরকে মনকামনা হাসিলের জন্য ডাকা, তাদের কাছে প্রার্থনা করা, তাদের কাছে সাহায্য সহযোগিতা চাওয়া, অনুরূপ আরও অনেক কিছু আছে। কেননা এসব কিছু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহকে অস্বীকার করার সমতুল্য। এ কলেমা হলো-ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালারই হক ও প্রাপ্য- একথার দলীল। অনুরূপ দোয়া ও সাহায্য চাওয়া, রুকু, সিজদা ও জবেহ করা এবং নযর ও মানুত-মানা প্রভৃতি ও আল্লাহর হকের মধ্যেই শামিল। এর মধ্যে কোন কিছু যদি কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত

٦٠- والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام - وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة -

٦١- ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه-

তরজমাঃ

৬০। আল্লাহর আযাব ও শাস্তি সম্পর্কে নিঃশংক, নির্ভয় ও বেপরোয়া হওয়া এবং তাঁর রহমত থেকে নিরাশ ও হতাশ হওয়া-দুটোই ইসলামী মিল্লাত থেকে বান্দাকে দূরে সরিয়ে নেয়া আহলে কিবলা অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য সত্য ও সঠিক পথ হলো এ দু'টোর মাঝামাঝি। (অর্থাৎ ভয়ও আশার মাঝখানেই হলো ঈমান)।

৬১। যে সব জিনিস স্বীকার করলে মানুষ ঈমানদার হয়, সেসব জিনিস অস্বীকার করলে তবেই কেবল কেউ ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যায়।

কোন মূর্তি, দেব-দেবী, প্রতীমা, ফিরিশতা, জিন, কবরবাসী প্রভৃতি কোন সৃষ্টির প্রতি অর্পণ করে, তবে সে আল্লাহর সাথে শিরক করলো। সে প্রকৃতপক্ষে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার ও বাস্তবায়ন করলনা। এর প্রত্যেকটি ব্যাপারই কোন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে খারিজ করবে। এ সম্পর্কে আলেমদের ইজমা ও ঐক্যমত রয়েছে। এসব বিষয় অস্বীকারের ব্যাপার নয়। কুরআন-সুন্নাহ এর অসংখ্য দলীল রয়ে গেছে। এখানে এমন আরো অসংখ্য বিষয় রয়েছে, যা করলে একজন মুসলমান কাফের হয়ে যায়।

টীকা ঃ

৬২। আসলে ঈমানের এ সংজ্ঞাটি অপূর্ণাঙ্গ এবং এতে চিন্তা ভাবনার অনেক অবকাশ রয়েছে। অনেক বিজ্ঞ-আলেমের মতে কথা, কাজ ও বিশ্বাসের নামই হল ঈমান। তাঁরা একেই ঈমানের সঠিক সংজ্ঞা বলে মনে করেন। আনুগত্যের কারণে ঈমান বাড়ে এবং নাফরমানির ফলে তা কমে যায়। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত।

মূলত ইমাম তাহাবী (রঃ) মৌলিক ঈমানের সংজ্ঞাই দিয়েছেন। আমরা তার

٦٢- والايمان: هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان -

٦٣- وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق -

তরজমা ঃ-

৬২। মুখে স্বীকার করা এবং অন্তরে সত্যায়ন ও সত্যতা স্বীকার করার নাম হল ঈমান।

(সালাফে সালেহীনের মতে, মুখে স্বীকার , অন্তরে বিশ্বাস এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাজ করা-এ তিনের সমষ্টির নাম ঈমান)

৬৩। (আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদে যা কিছু নাযিল করেছেন তা সব এবং) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে শরীয়াতের বিধি-বিধান হিসেবে বা হুকুম-আহকামের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা রূপে সহীহ ও সঠিক ভাবে যা বর্ণিত হয়েছে, তার পুরোটাই বরহক ও সত্য।

অংশ নয়। বরং তা আমলের ভিত্তি। কিন্তু কামেল বা পূর্ণ ঈমান অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল-এ তিনটির সমন্বয়ে গঠিত। আমল তার আবশ্যকীয় অংশ। আমল ব্যতীত কামেল ঈমান হয়না। এখন মৌলিক ঈমান ও কামিল ঈমানের পার্থক্য স্পষ্ট হল। আমল বা কাজ মৌলিক ঈমানের অংশ নয়। বরং কামিল ঈমানেরই অংশ। তাই মূল ঈমানে যতক্ষণ ত্রুটি না ঘটবে, ততক্ষণ কবিরাগুনাহ্ করার কারণে কেউ কাফের হবেনা। তবে ফাসেক হবে। কিন্তু যে কোন ফরয কাজের ফরয হওয়াকে অস্বীকার করলে কিংবা কোন হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করলে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা।

খারেজী ও মু'তাজিলাদের মতে, আমল বা কাজ মূল ঈমানেরই অংশ। তাই খারেজিদের মতে আমল তরককারী একেবারেই কাফের। আর মু'তাজিলাদের মতে আমল তরককারী ঈমানদারও থাকেনা। তবে কাফের ও হয়না। এদু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে। কিন্তু এ উভয় ফেরকার মতে, আমল তরককারী চির জাহান্নামী।

والايمان واحد - وأهله في أصله سواء -
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى
وملازمة الأولى -

তরজমা ঃ- ৬৪। ঈমান এক ও অবিভাজ্য এবং ঈমানদারগণ মূল ঈমানে সমান। তবে আল্লাহর ভয়, তাকওয়া, খায়েশ ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ এবং নেক ও উত্তম কাজের নিয়মিত অনুশীলনের ভিত্তিতেই ঈমানদারদের মধ্যে মর্যাদায় ও মর্তবায় তারতম্য হয়ে থাকে।

মুরজিয়াহ্ ফেরকার মতে, ঈমানের সাথে আমলের কোনই সম্পর্ক নেই। তাই ঈমান আনার পর আমলের কোনই প্রয়োজন নেই। কোন প্রকার গুনাহ্ করলে ঈমানের কোন ক্ষতি হয়না। বরং হাজারো গুনাহ্ করার পরও সে কামিল ঈমানদারই থাকে এবং আখিরাতে কোনরূপ শাস্তি ছাড়াই নাজাত বা মুক্তি পাবে এবং জান্নাতে যাবে।

এ ভিন ফেরকার মতামত বাতিল এবং অগ্রহণযোগ্য।

টীকা ঃ

৬৪। "ঈমান এক ও অবিভাজ্য এবং ঈমানদারগণ মূল ঈমানে সমান" কোন কোন বিশিষ্ট আলেম এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তারা বলেন, একথাটি ঠিক নয়। ঈমানের ক্ষেত্রে ঈমানদারদের মধ্যে অনেক ব্যবধান ও তারতম্য রয়েছে। কেননা, নবী রাসূলগণের ঈমান অন্যদের ঈমানের মত নয়। খুলাফায়ে রাশিদীন ও সাহাবায়ে কিরামের ঈমান অন্যান্যদের ঈমানের মত নয়। অনুরূপ খাঁটি মুমিনদের ঈমান ফাসেকদের ঈমানের মত নয়। তাই সব ঈমানদারের ঈমান এক সমান নয়। বরং ব্যক্তি ভেদে ঈমানে তারতম্য আছে। অন্তরে আল্লাহ্ তায়ালা, তাঁর নামসমূহও গুনাবলী এবং শরীয়াতের বিধান গুলো সংক্রান্ত জ্ঞানের তারতম্যের কারণে বিভিন্ন ঈমানদারের ঈমানে তারতম্য হয়ে থাকে। তাই এই জ্ঞানের তারতম্যই বিভিন্ন লোকের ঈমানে তারতম্য হওয়ার মূল কারণ। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মত। এর দলীল ঃ

٦٥- والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقران -

٦٦- والإيمان : هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى -

তরজমা ঃ- ৬৫। মমিনগণ সবাই পরম দয়াবান আল্লাহর ওলী। আর আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তিনি সব চেয়ে সম্মানিত ও মর্যদাবান, যিনি আল্লাহর অধিকতর আনুগত্য কারী এবং কুরআনের সর্বাধিক অনুসারী।

৬৬। ঈমান হলো, আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফেরেশতামন্ডলী, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর নবী রাসূলগণ, আখিরাতের দিন, মৃত্যুর পর পুনঃজীবন লাভ এবং তাকদীরের ভালোমন্দ, স্বাদ-বিস্বাদ, তিক্ততা ও দুঃখ-কষ্ট সবই আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে-এসব বিষয়ের উপর ঈমান আনা।

রাসূল (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন ঃ

ما فضلكم أبو بكر بصلاة ولاصوم ولاصدقة ولكن بشئ وقر فى قلبه -

অর্থ ঃ-

এখানে হযরত আবু বকর (রাঃ) অন্তরে যা অবস্থান করছে তা হল ঈমান। তাই অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আবু বকর (রাঃ) এর ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হল ঈমান।

ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা যে রাত ঘটেছে, তার পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লোকজনের নিকট রাত্রের এ ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। তা শুনে কয়েকজন লোক-যারা সবেমাত্র ঈমান এনেছিল-মুরতাদ হয়ে গেল। অতঃপর তারা এখবর নিয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ) এর নিকট এল এবং বললো, আপনার বন্ধুর কিছু খবর রাখেন কি? তিনি বলছেন যে, আজ রাত নাকি তিনি বায়তুল মাকদিস নীত হয়েছেন। একই রাতে গিয়েছেনও। আবার ফিরেও এসেছেন ভোর হওয়ার আগেই। আবু বকর (রাঃ) বললেন ঃ

٦٧- ونحن مؤمنون بذلك كله - لانفرق بين احد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاؤا به -

৬৭। উপরোক্ত বিষয় গুলোর উপর আমরা দৃঢ় ঈমান পোষণ করি। আমরা আল্লার নবী রাসূলগণের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য ও ভেদাভেদ করিনা। তাঁরা আল্লাহর কাচ থেকে যে শরীয়াত নিয়ে এসেছেন, তা সবই সত্য বলে বিশ্বাস করি।

أو قال ذلك؟ إن كان قال ذلك فقد صدق - إني والله لأصدقه فيما هو اعظم من ذلك - إني لأصدقه في خبر السماء -

"তিনি কি তা বলেছেন? যদি তা তিনি বলে থাকেন, তবে সত্য বলেছেন। আল্লাহর কসম, আমি তো তাঁকে এর চেয়েও বড় ব্যাপারে বিশ্বাস করি। আমি তো (রোজই সকাল সন্ধ্যায়) তাঁর কাছে আসমান থেকে আগত খবর শুনে তা সত্য বলে বিশ্বাস করি।" (বায়হাকী, হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ইবনে জরীর, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, ইবনে আবি হাতিম, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত।)

এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হলো যে, হযরত আবু বক্কর রাঃ এবং অন্যদের ঈমানে বিরাট ব্যবধান।

টীকা ঃ-৭২

খিলাফত ও ইমামত ঃ

ইসলামী পরিভাষায় ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধানকে খলীফা, ইমাম, আমীরুল মুমিনীন প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে সর্ব সম্মত ভাবে ফরয। কুরআন, হাদীস, সাহাবা কেরামের ইজমা, ইমাম-মুজতাহিদগণের রায় হলো এর দলীল। এ বিষয়টি ইসলামী আকীদার মধ্যে শামিল। এর সংজ্ঞা নিম্ন রূপ-

ইমাম মা ওয়ার্দী (রঃ) বলেন,

٦٨- وأهل الكبائر (من امة محمد صلى اللّه عليه وسلم) فى النار لايخلدون اذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين - بعد أن لقوا اللّه عارفين (مؤمنين) وهم فى مشيئته وحكمه - إن ساء غفرلهم وعفاعنهم بفضله كما ذكر عز وجل فى كتابه : وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ - (النساء - ٤٨، ١١٦) وإن شاء عذبهم فى النار بعد له - ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من اهل طاعته - ثم يبعثهم الى جنته - وذلك بأن اللّه تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته - اللهم يا ولى الاسلام وأهله ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك به -

৬৮। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মাতের যারা কবিরা গুনাহ্ করে, তাওহীদবাদী হিসেবে যদি তাদের মৃত্যু হয়, তবে তওবা না করলেও তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবেনা। তবে শর্ত হলো, তাওহীদে বিশ্বাসী ও ঈমানদার হিসেবেই আল্লার নিকট হাযির হতে হবে। তাদের পরিণতি আল্লার ইচ্ছা ও হুকুমের উপর নির্ভরশীল হবে। তিনি যদি চান, তাঁর মেহেরবানীতে তাদেরকে

الامامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا -

ইসলামের রক্ষা ও হেফাজতে এবং দুনিয়ার রাজনৈতিক কর্তৃত্বে নবীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রতিষ্ঠিত ও নিযুক্ত ব্যক্তিত্বকেই ইমাম, খলিফা বা ইসলামী সরকার প্রধান বলা হয়। (আল-আহকামুস্-সুলতানিয়া-পৃঃ-৫)

আল্লামা তাফতাযানী (রঃ) ও অনুরূপ সংজ্ঞাই দিয়েছেন। হযরত আদম (আঃ) যমীনে আল্লার প্রথম খলীফা ছিলেন। পৃথিবী আবাদ করা, মানুষের উপর

ক্ষমা করবেন ও মাফ করে দেবেন। যেমন- মহান আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء – ٤٨، ١١٦)

তরজমা ঃ- শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ্ যাকে ইচ্ছা তিনি মাফ করে দেবেন। (আন্-নিসাঃ ৪৮ও ১১৬)

আর তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে অনুরূপ গুনাহ্গারদেরকে তাঁর ইনসাফের দৃষ্টিতে গুনাহ্ পরিমাণ জাহান্নামে আযাব দিবেন। অতঃপর নিজ মেহেরবানীতে এবং তাঁর নেক ও আনুগত্যশীল বান্দাদের মধ্যে যারা শাফায়াত করার অনুমতি পাবেন, তাদের সুপারিশে জাহান্নাম থেকে ওদেরকে বের করে আনবেন এবং আবার জান্নাতে পাঠাবেন। এর কারণ আল্লাহ্ তায়ালাই হলেন ঈমানদারদের একমাত্র মাওলা ও অভিভাবক। যারা (তাঁকে অস্বীকার করেছে,) তাঁর হিদায়াত থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে এবং তাঁর বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব লাভে সক্ষম হয়নি, আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়া-আখিরাতে ঈমানদারদেরকে এসব কাফেরদের মতো বানাননি।

হে আল্লাহ্, ইসলাম ও মুসলমানদের মাওলানা, আমাদেরকে তোমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত ইসলামের উপর স্থির ও অটল রাখ।

রাজনৈতিক নেতৃত্বদান, মানবতার পূর্ণতা বিধান এবং মানুষের মধ্যে আল্লার আইন-কানুন জারী করার জনাই আল্লাহ্ তায়ালা সব নবীকে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি বানিয়েছেন। (আল্লামা আলুসী (রঃ), রুহুল মাআনী ১ম, পৃঃ -২৩০) অন্যরা হলেন নবীদের প্রতিনিধি।

খলীফা যিনিই হোননা কেন, ন্যায়ে তাঁর আনুগত্য করা ফরয। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ – (النساء – ٥٩)

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্, রাসুলের এবং তোমাদের শাসন কর্তাদের আনুগত্য কর। (নিসা-৫৯)

এখানে উলিল আমর মানে শাসন কর্তা। (আল-আহ্কামুস্ সুলতানিয়া,

٦٩–ونرى الصلوة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم–

তরজমাঃ

৬৯। আমরা আমাদের কিবলার অনুসারী যে কোন নেককার ও বদকার মুসলমানের পেছনে নামায আদায় করা এবং মুসলমানদের কেউ মারা গেলে তার জানাজার নামায পড়া জায়েজ মনে করি।

ইমাম মাওয়ার্দী (রঃ), পৃঃ-৫)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِيْ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ عَصى أَمِيْرِيْ فَقَدْ عَصَانِيْ –

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো, যে আমার নাফরমানী করলো, সে আল্লাহরই নাফরমানী করলো। আর যে আমার নিযুক্ত শাসনকর্তার আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো। যে আমার নিযুক্ত শাসনকর্তার নাফরমানী করলো, সে আমারই নাফরমানী করলো। (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ – وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ – قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ فُوْا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوْهُمْ

৭০–ولاننزل احداً منهم جنة ولا ناراً – ولانشهد عليهم بكفر ولابشرك ولابنفاق مالم يظهر منهم شئ من ذلك – ونذر سرائرهم الى الله تعالى –

তরজমাঃ

৭০। আমরা কোন মুসলমান সম্পর্কে জান্নাতী কিংবা জাহান্নামী হওয়ার ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত দিতে পারিনা। তাদের কারো বিরুদ্ধে কাফের, মুশরিক ও মুনাফিক হয়ে যাওয়ার সাক্ষ্য এবং ফতোয়াও দেইনা, যতক্ষণ তাদের থেকে সেরূপ কোন কিছু প্রকাশ না পায়। আর তাদের গোপন বিষয়াবলী আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট সোপর্দ করে থাকি।

حَقَّهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ –

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের নবীগণই নেতৃত্ব করতেন। একজনের মৃত্যুর পর অন্যজন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে কোন নবী নেই। আমার পরে হবে খলীফা এবং তারা সংখ্যায় অনেক হবে। সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, প্রথম যার বাইয়াত কর, তার আনুগত্য করবে। অতঃপর যার বাইআত, আনুগত্য তার। তাদের সবার অধিকার পূরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ জনগণের শাসন পরিচালনা সম্পর্কে তাদের শাসনকর্তাদের জিজ্ঞাসা করবেন। (বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

নবী করিম (সাঃ) বলেছেন-

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً –

যে লোক মারা গেল, অথচ তার গর্দানে (ইমামের) বাইআত নেই, সে জাহেলী মৃত্যু বরণ করলো। (মুসলিম)

গোটা মুসলিম উম্মার মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাঃ) কে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন এবং তাঁরাই কুরআন হাদীসে ও ইসলাম সম্পর্কে বেশী জ্ঞান রাখতেন। সরাসরি রাসূল (সাঃ) থেকেই তাঁরা ইলম অর্জন করেছেন। রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর তাঁর দাফন-কাফন ফরয ছিল। পরবর্তী নবীর

٧١- ولانرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف -

তরজমাঃ

৭১। আমরা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মতের কোন লোকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করা জায়েজ মনে করিনা। তবে (শরীয়াতের বিধান মতে) যাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া ফরয, তার কথা আলাদা (ইসলামী সরকারই তা কার্যকরী করবে। আইন হাতে তুলে নেয়া কোন ব্যক্তির পক্ষে জায়েজ নয়)।

নির্বাচন করাও ছিল ফরয। দুটি ফরয জমা হয়ে গেল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম নবী-করীম (সাঃ) এর কাফন-দাফনের আগে খলীফা নির্বাচন করলেন। খলীফা নির্বাচনে আড়াই দিন সময় অতিবাহিত হলো। হযরত আবুবক্কর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর মসজিদে নববীতে সব সাহাবায়ে কিরামকে জমায়েত করে ভাষণ দিলেন এবং রাসূল (সাঃ) এর কাফন-দাফনের দেরী হওয়ার কারণ দর্শিয়ে বললেন-

أَلَا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَضَى فِيْ سَبِيْلِهِ وَلَابُدَّ لِهٰذَا الْأَمْرِ مِنْ قَائِمٍ يَقُوْمُ بِهِ - فَانْظُرُوْا وَهَاتُوْا آرَاءَكُمْ -

জেনে রাখ, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর পথে চলে গেছেন। এখন ইসলামের জন্য এমন এক ব্যক্তির অতীব প্রয়োজন, যিনি তা কায়েম রাখবেন। এখন তোমরা ভেবে দেখ এবং তোমাদের মতামত পেশ কর।" (আন্-নাযরিয়াতুল্ সিয়াসিয়া, ডঃ জিয়াউদ্দিন রিস, পৃঃ- ১৩২, কিতাবুল মাওয়াকিফ ওয়া শারহুহু, ৩য় জিলদ, পৃঃ- ৩৫৬)

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন,

فقد اجمعوا على وجوب نصب الامام - (شرح فقه اكبر)

'ইসলামী সরকার প্রধান নিয়োগ যে ওয়াজিব এব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের 'ইজমা' হয়েছে (শরহে ফিকহে আকবর।)' একই মত ব্যক্ত করেছেন ইমাম মাওয়ার্দী (রাঃ), আল্লামা তাফতাযানী (রঃ), ইমাম নাববী (রঃ), ইমাম ইবনে

۷۲- ولانرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وإن جاروا - ولاندعوا عليهم ولاننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عزوجل فريضة - مالم يامروا بمعصية - وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة -

তরজমা ঃ ৭২। আমরা ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা অর্থাৎ সরকার প্রধান, বিভিন্ন নেতৃবর্গ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েজ মনে করিনা-তারা যদি যুলমও করে। আমরা তাঁদের জন্য বদদোয়াও করিনা এবং তাদের আনুগত্য থেকে হাতও গুটিয়ে রাখিনা। বরং তাদের আনুগত্য করাকে আমরা আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্যের ন্যায় ফরয মনে করি-যতক্ষণ তাঁরা আল্লাহ্ ও রাসূলের নাফরমানী ও অবাধ্যতার আদেশ না দেন। (তাঁরা যদি যালিম হন, তবে) আমরা তাঁদের সংশোধন করা এবং যুলুম থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য (আল্লাহ্র কাছে) দোয়া করি।

তাইমিয়া, শাহওয়ালী উল্লাহ প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ। কারণ তা না হলে ইসলামের কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা। ইসলামের সব বিধিবিধান অনন্তব হয়ে দাঁড়াবে। মুসলমানের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় নেমে আসবে। মুসলমানরা বিজাতির অধীন হয়ে যাবে। দীন-দুনিয়া দু'টিই হারাবে। তাই ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা তথা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ করা ফরয। আর এজন্য জামায়াত বদ্ধ হওয়াও ফরয। বিচ্ছিন্ন থাকা বা হওয়া নাজায়েয।

খিলাফত কায়েম না থাকলে মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে পারেনা। আল্লাহর বন্দেগী করতে পারেনা। তাই মানুষের উপর আল্লাহ্ দু'টি দায়িত্ব আরোপ করেছেন। এক হলো ইবাদত, অন্যটি হলো খিলাফত। এদু'টি পরস্পর নির্ভরশীল। খিলাফতের অবর্তমানে অন্যটি আদায় করা অসম্ভব। ঈমানের পূর্ণতার জন্য দু'টিই জরুরী। ইবাদত ও খিলাফতের কোনটির একটি বাদ দিলে সেটির জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। শুধু ইবাদত করায় অর্ধেক দায়িত্ব আদায় হয়। আবার ইবাদত বাদ দিয়ে শুধু খিলাফত কায়েমের চেষ্টা করায়ও অর্ধেক ফরয আদায় হয়। এটা পূর্ণ ঈমান নয়। যেহেতু ঈমানদারের

٧٣- ونتبع السنة والجماعة - ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة -

তরজমা ঃ

৭৩। আমরা রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ ও মুসলমাদের জামায়াতের অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসরণ করি। (১) এবং বিচ্ছিন্নতা, বিরোধ ও বিভেদ সৃষ্টিকে পরিহার করে চলি।

জীবনের উদ্দেশ্য দু'টোই। তাই দুটোই এক সাথে করে যেতে হবে। রাসূল (সাঃ) এদু'টোর দাওয়াতই এক সাথে দিয়েছেন। এজন্য বাতিলের পক্ষ থেকে তাঁর দাওয়াতের বিরোধিতা এবং নির্যাতনও সাথে সাথেই শুরু হয়েছে। (মাওলানা মু. তৈয়ব (রঃ) মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত, খুতবাতে হাকীমুল ইসলাম-উর্দু- ২য় খন্ড)

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ - وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا - يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا - وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ -

النور - ৫৫-

তরজমা ঃ- তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদের কে তেমনিভাবে পৃথিবীতে অবশ্যই খলীফা বানাবেন যেমনভাবে তাদের পূর্ববর্তী লোকদের বানিয়েছিলেন। আর তাদের দীনকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করে দেবেন-যা তাদের জন্য তিনি পছন্দ করেছেন। এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা শুধু আমারই ইবাদত-বন্দেগী করবে, আমার সাথে কাউকেও শরীক করবেনা। (সুরা নূর

٧٤- ونحب أهل العدل والأمانة - ونبغض أهل الجور والخيانة -

৭৪। আমরা ন্যায়বান এবং সৎ, বিশ্বস্ত আমানতদার ব্যক্তিদেরকে ভালবাসি। আর যালিম ও আমানতে খেয়ানতকারী অসৎ লোকদের কে ঘৃণা করি।

-৫৫)

এখানে খিলাফত ও খিলাফত লাভের অর্থ হলো, 'আল্লাহর সর্বোচ্চ প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়ে তাঁর শরীয়তি বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার ইখতিয়ার প্রয়োগ করা।' তাই কেবল খাঁটি ঈমানদার ও সৎ এবং নেক-বান্দারাই আল্লাহর খলিফা হওয়ার যোগ্য। খিলাফতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা এদের পক্ষেই সম্ভব। মুশরিক, কাফের ও ফাসেক খলীফা নয় বরং বিদ্রোহী। একটি দেশ পরিচালনায় যত সংখ্যক লোক প্রয়োজন- তত সংখ্যক লোক যদি পূর্ণ ঈমান, সততা ও যোগ্যতার অধিকারী হয় তখন তাদের হাতে এই খিলাফত দান করবেন বলে আল্লাহ্ তায়ালা ওয়াদা করেছেন। যেমন রাসুল (সাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল। আয়াতের হুকুম কেবল এ দু'যুগের সাথে খাস ও নির্দিষ্ট নয়। সর্বকালের জন্য আল্লাহর এই ওয়াদা। তাই যে যুগেই এমন গুণ সম্পন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক কোন ভূখন্ডে তৈরী হয়ে যাবে, সে যুগেই যে ভূখন্ডে আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা দান করবেন, যাতে আল্লাহর শরীয়তী বিধান মুতাবিক তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যথার্থভাবে পালিত হবে। এই খিলাফত প্রতিষ্ঠার ফলেই আল্লাহর দীন অর্থাৎ ইসলাম মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে এবং মুসলমানরা পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে। দুনিয়া মুসলিম শক্তিকে ভয় করবে। আর এই মুসলিম শক্তি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবেনা। এ পুরস্কার লাভের জন্য শর্ত হলো, খালেস ভাবে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করতে হবে এবং আল্লাহর সাথে শিরক এর বিন্দুমাত্র সংমিশ্রণ ঘটানো যাবেনা। মূলতঃ খিলাফত লাভের জন্য যেমন এসব হল পূর্ব শর্ত- তেমনি তা কায়েমের পরই কেবল এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া এবং গোটা মুসলিম জনগোষ্ঠির পক্ষে শিরক মুক্ত খালেস ভাবে আল্লাহর বন্দেগী করা সম্ভব। এজন্যেই খিলাফতকে মুসলমানদের আকীদার বিষয় গুলোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র থাকবে, অথচ তা ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক

٧٥– ونقول: الله اعلم فيما اشتبه علينا علمه –

৭৫। দীন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে দ্বিধায় পড়লে আমরা বলে থাকি
اَللّٰهُ أَعْلَم। অর্থাৎ আল্লাহ-ই ভাল জানেন।

চলবেনা- এটা অকল্পনীয়। তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় মুসলমানরা কুরআন -সুন্নার শাসন চাইবেনা, এজন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবেনা। অথচ নিজেদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করবে। আকীদা সম্পর্কে অজ্ঞতাই এর মূল কারণ।

ইমাম ঃ ইমাম মানে নেতা। ইমামত মানে নেতৃত্ব। ফিকাহ শাস্ত্রে ইসলামী রাষ্ট্রে সরকার প্রধানের পদকে বড় ইমামতি (امامت عظمى ياكبرى) বলে। আর নামাযের ইমামতিকে ছোট ইমামতি (امامت صغرى) বলে। দেশের প্রধান মসজিদে সবদিক দিয়ে ছোট ইমামতি করার জন্য যিনি যোগ্যতম ব্যক্তি,এবং যার মধ্যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা বিদ্যমান, তিনিই সেই রাষ্ট্রের বড় ইমাম অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রধান হওয়ার যোগ্য। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং সরকার প্রধান নিযুক্ত করা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং মুজতাহিদগণের রায়ে ফরয।

ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধানকে খলিফা, ইমাম, আমীরুল মুমিনীন কিংবা প্রচলিত যে কোন পরিভাষায় নামকরণ করা যায়।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) শরহে ফিক্‌হে আকবারে, ইমাম আবুল হাসান মাওয়ার্দী (রঃ) আল-আহকামুস্ সুলতানিয়াতে, আল্লামা তাফতাযানী 'শরহে আকায়েদে নাসাফীয়াতে, ইবনে হাযাম 'আলফসলু ফিল মিলাল ওয়ান্নিহালে, শাহওয়ালী উল্লাহ্ (রঃ) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায়, ইমাম ইবনে তাইমিয়া আস-সিয়াসাতুস্ শারয়ীয়াতে ইসলামী সরকার প্রধান নিয়োগ করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম এবং উম্মাতের উলামায়ে কেরামের যে ইজমা ও ঐক্য বদ্ধ মত রয়েছে কুরআন-হাদীসের আলোকে তা সপ্রমাণিত করেছেন। তা না হলে কুরআন-হাদীসের কার্যকারিতা, উম্মাতের একতা, জাতীয় শান্তি ও নিরাপত্তা থাকেনা। জিহাদ বন্ধ হয়ে যায়। মুসলমানরা বাতিলের অধীন হয়ে যেতে বাধ্য হয়। এজন্য ন্যায়পরায়ণ সরকার বা ইমামে আদেল অপরিহার্য। এমন কি ইমামে আদেল যদি না-ও থাকেন ফাসেক ব্যক্তিও যদি সরকার প্রধান হয়ে

٧٦- وَنَرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر-

৭৬। আমরা সফরে ও মুকীম অবস্থায় মোজার উপর (এক ধরনের মোটা মোজা) মুসেহ করা জায়েয মনে করি। যেমন হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে।

বলেন, যতদিন তিনি প্রকাশ্য কুফরী না করবেন ন্যায় কাজে তাঁর আনুগত্য করে যেতে হবে। শিয়া মতে, ইমাম হতে হলে মাসুম বা নিষ্পাপ হওয়া শর্ত। অথচ নবীগণ ছাড়া মাসুম আর কেউ নন। খারেজী ও মুতাজিলাদের মতে, ফাসেক ও যালিম খলিফা হতেই পারেনা। আদেল পাওয়া না গেলে দেশ ধ্বংস হয়ে গেলেও খলিফার পদ শূন্য থাকবে। আর মুরজিয়াদের মতে ফাসেক, জালিম যে ব্যক্তিই খলিফা হোক অন্যায় যতই চলুক, কোন রূপ প্রতিবাদই করা যাবে না। ইমাম আবু হানিফা এ সব মতের জবাবেই ফাসেক ইমামের আনুগত্যের কথা বলেছেন। ইমাম তাহাবী এখানে সে কথাই বলেছেন। সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীস ঃ

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وتلعنونهم ويلعنونكم - قال قلنا يا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذٰلِكَ قَالَ لاَ مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلٰوةَ -

তরজমা ঃ- হযরত আউফ ইবনে মালিক আশজায়ী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের উত্তম নেতা হলো তারা, যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে, তোমরা তাদের জন্য দোয়া কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে। আর তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হলো তারা, যাদেরকে তোমরা শত্রু ভাব এবং তারাও তোমাদেরকে শত্রু ভাবে, তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও, তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়।

৭৭–والحج والجهاد ماضيان مع أولى الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة– لايبطلهما شئ ولاينقضهما–

তরজমা ঃ

৭৭। হজ্জ ও জিহাদ- দু'টিই ফরয। মুসলমানদের ইসলামী রাষ্ট্রের যিনি যখন শাসনকর্তা হবেন, তখন তাঁর নেতৃত্বে, পৃষ্ঠপোষকতায় ও পরিচালনায় কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জ ও জিহাদ জারী ও চালু থাকবে। সেই শাসনকর্তা সৎ ও নেককার হোন কিংবা ফাসেক ও বদকার। কোন কিছুই এ দুটি ফরযকে বাতিল বা রহিত করতে পারবেনা। (অবশ্য শাসনকর্তা সুস্পষ্ট কুফরী বা ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত হলে আলাদা কথা)।

বর্ননাকারী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লার রাসুল, এমন অবস্থায় আমরা কি তাদের সাথে লড়াই করবো না? জবাবে তিনি বললেন, যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম রাখে, ততক্ষণ তা করো না।

عن نعمان بن بشير قال كنا قعود أفى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بشير رجلاً يكف حديثه فجاء ابوثعلبة فقال بشير بن سعد آتحفظ حديث رسول الله فى الأمراء فقال حذيفة انا احفظ خطبته فجلس ابوثعلبة الخشنى فقال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تكون النبوة فيكم ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها – ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون مايشاء الله ان تكون ثم يرفعها اذاشاء ان يرفعها – ثم تكون ملكا عاضا فيكون ماشاء ان يكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا

٧٨– ونؤمن بالكرام الكاتبين فان الله قد جعلهم علينا حافظين –

তরজমা ঃ-

৭৮। আমরা (আমল নামা লেখক) 'কেরামান কাতেবীন' ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান রাখি। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদেরকে আমাদের কথা ও কাজের উপর পর্যবেক্ষক ও সংরক্ষক নিযুক্ত করেছেন।

جبرية فتكون ماشاء ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها – ثم تكون خلافة على منهاج النبوة – احمد فى عدة مواضع منها ٢٧٣/٤ مطولا – سنن ابى داؤد ٢١١/٤ وعند الترمذى ٥٠٣/٤ مختصرا –

তরজমা ঃ

হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, আমরা মসজিদে নববীতে বসা ছিলাম। বশীরের কাছে রাসূলের হাদীস সংরক্ষিত ছিল। আবু সা'লাবা এলেন। বশীর ইবনে সায়াদ জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (সঃ) এর শাসন সংক্রান্ত কোন হাদীস তোমার কাছে সংরক্ষিত আছে? তখন হুজায়ফা (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলের (সঃ) ভাষণ সংরক্ষণ করেছি। অতঃপর আবু সা'লাবা খুশানী বসলেন। হুজায়ফা (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন,

"আল্লাহ্ যতদিন চান, তোমাদের মধ্যে ততদিন নবুওয়াত বিদ্যমান থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ যখন চাইবেন, তা তুলে নেবেন। তারপর নবুওয়াতী পদ্ধতিতে খেলাফত কায়েম হবে। আল্লাহ্ যদ্দিন চাইবেন, তা থাকবে। এরপর আল্লাহ্ যখন চাইবেন তা তুলে নেবেন, অতঃপর নিষ্ঠুর ও দুষ্ট প্রকৃতির বাদশাহী শুরু হবে। তিনি যতদিন চাইবেন, তা বর্তমান থাকবে। পরে যখন চাইবেন তা তুলে নেবেন। অতঃপর জবর দখলকারী, স্বৈরাচারী রাজত্ব শুরু হবে। এটাও যতদিন আল্লাহ্ চান, চালু থাকবে। এরপর যখন চাইবেন, তা তুলে নিবেন। অতঃপর নবুওয়াতী পদ্ধতির ও সে মানের খেলাফত কায়েম হবে।" (মুসনাদে আহমাদ, ৪র্থ জিলদ, পৃঃ -২৭৩ বিস্তারিত, সুনানে আবি দাউদ, ৪র্থ জিলদ, ৩১১পৃঃ
-

৭৯- وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُوَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ

তরজমাঃ

৭৯। আমরা মালাকুল মাউত অর্থাৎ মৃত্যুর ফিরিশ্‌তার উপর ঈমান রাখি যিনি বিশ্বের সবার রুহ কবয করার দায়িত্ব ও আদেশ প্রাপ্ত।

তিরমিযী, ৪র্থ জিলদ পৃঃ৫০৩, সংক্ষিপ্ত ভাবে)।

এই হাদীসের ঘোষণা ও ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী নবী করিম (সঃ) এর ইন্তেকালের সাথে বরকতময় নবুওয়াতী শাসন উঠে যায়। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) ত্রিশ বছর মুসলিম জাহান সঠিক নবুওয়াতী মানে ও পদ্ধতিতে শাসন করেন। এই আমলকেই খেলাফতে রাশেদা বলা হয়। অতঃপর নিষ্ঠুর জালিম বাদশাহী শুরু হয়। বনী উমাইয়া, আব্বাসী ও তুর্কী উসমানী শাসনের মধ্য দিয়ে এ যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। তারপর ১৯২৪ সালে তুর্কী খেলাফতের সমাপ্তি ও মোস্তফা কামাল পাশার ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে জবর দখলকারী স্বৈরাচারী শাসন শুরু হয়। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন নামে এই স্বৈরাচারী শাসনই চলছে। রাসূল (সঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই স্বৈরাচারী শাসনের সমাপ্তির পরেই দুনিয়ায় আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করবে খেলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াত-নবুওয়াতী তরীকার ও সে মানের খেলাফত। নবী করীম (সঃ) এর প্রতি ঈমানের দাবিই হলো এই হাদীসের সত্যতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। এতে করে জবর দখলকারী, স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধিতা এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রাণপনে শরীক হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে।

টীকা ঃ- ৭৩। সুন্নাত মানে, রাসূলে করীম (সাঃ) এর নীতি, আদর্শ, তরীকা, পন্থা, ও পদ্ধতি। আল-জামায়াত মানে, মুসলমানদের একমাত্র জামায়াত। তাঁরা হলেন, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁদের অনুসরণ করে চলেন। এ পথের অনুসারীরা হিদায়াত প্রাপ্ত ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের লোক এবং এর বিরোধীরা ভ্রান্ত, গোমরাহ ও বেদাতী। এর বিস্তারিত বর্ণনা অন্যত্র দেয়া হয়েছে।

টীকা- ৭৭। জিহাদ শব্দের অর্থ 'চূড়ান্ত প্রচেষ্টা'। ইসলামী পরিভাষায়

٨٠- وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً - وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم -

তরজমাঃ

৮০। আমরা শাস্তিযোগ্য লোকের কবরে আযাব হওয়া বিশ্বাস করি। আর কবরে মুনকির নাকীর এসে মৃত ব্যক্তিকে তার রব, নবী ও দীন সম্পর্কে যে প্রশ্ন করবেন, আমরা তা-ও বিশ্বাস করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে এ ব্যাপারে অনেক হাদীস ও বাণী বর্ণিত আছে।

ইসলামের বিজয় এবং আল্লার কালামের ঝান্ডা বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে আল্লার পথে চূড়ান্ত পর্যায়ের চেষ্টা-সাধনা করাই হলো জিহাদ। এই প্রচেষ্টা হাত-মুখ, ধনমাল, সময়দান, আয়ু খরচ, শ্রম, কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করা এবং লিখনী দ্বারাও যেমন হয়ে থাকে, তদ্রূপ দুশমনদের মুকাবিলায় লড়াই-সংগ্রাম এবং জীবন দেয়া-নেয়ার মাধ্যমেও হয়ে থাকে। যখন যা প্রয়োজন এবং যার যা আছে, এ পথে তখন তা চূড়ান্ত ভাবে নিয়োজিত করাই জিহাদ। আল-ইকনা (اقناع) কিতাবের লেখক জিহাদের হাকীকত সম্বন্ধে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার লিখিত এই ব্যাখ্যাটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

الامر بالجهاد منه مايكون بالقلب كالعزم عليه ومنه مايكون باللسان كالدعوة الى الاسلام بالحجة والبيان والرائ التلة بيرفى ما فيه نفع المسلمين وبالبدن اى القتال بنفسه - فيجب القتال بغاية مايمكنه من هذه الامور - (خلد -١- صـ٢٥٢)

অর্থাৎ মনের জিহাদ হলো সংকল্প করা, মুখের জিহাদ হলো ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়া, যুক্তি প্রমাণ, বক্তৃতা-বর্ণনা মতামত পেশ এবং মুসলমানদের উপকার ও কল্যাণে চেষ্টা-তদ্বির করা। আর জীবন দিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধ করা হলো

٨١- والقبر روضة من رياض الجنة أوحفرة من حفر النيران-

তরজমাঃ

৮১। আমাদের মতে কবর হলো বেহেশতের বাগ-বাগিচা সমূহের একটি উদ্যান কিংবা জাহান্নামের গহবর সমূহের একটি গভীর গহবর।

সশরীরের জিহাদ। এসব কিছু দিয়ে যথাসাধ্য চূড়ান্ত লড়াই সংগ্রাম করা ফরয।

বিশেষ সময়েই কেবল শত্রু বাহিনীর সাথে যুদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু একজন ঈমানদারের গোটা জীবন এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই জিহাদে অতিবাহিত করতে হয়। তাই সশস্ত্র যুদ্ধই কেবল জিহাদ নয়। ইসলামী রাষ্ট্র না থাকলে তা প্রতিষ্ঠার যে সর্বাত্মক প্রয়াস, সেটাও জিহাদ এবং তা করাও ফরয। সূরা আল-ফুরকান সর্বসম্মত ভাবে মক্কী সূরা। তাতে বলা হয়েছে-

فَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا -৫৫ -

তরজমা ঃ- হে নবী, কাফেরদের আনুগত্য করবেন না, বরং কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে কঠোর জিহাদ করুন। (৫২)

অথচ মক্কায় তখন সশস্ত্র যুদ্ধের নির্দেশ ছিলনা। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরই কেবল সশস্ত্র যুদ্ধের নির্দেশ এসেছিল। এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম (রঃ) লিখেছেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা যে মুহূর্তে রাসূল (সাঃ) কে নবুয়াত দান করেছেন, সেই মহূর্ত থেকেই জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন।" (যাদুল মা'আদ- জিলদ-৩, পৃঃ-৫২)

সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র থাকলে যেমন জিহাদ ফরয, না থাকলে তা প্রতিষ্ঠার জন্যও জিহাদ ফরয। এবং কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত রাখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদায় বিশ্বাসীদের উপর ফরয।

কুরআনের অসংখ্য আয়াত এবং অগণিত হাদীস, উম্মাতের ইজমা আর ইমাম মুজতাহিদীগণের রায় হলো এর দলীল। তার কিছুটা এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

٨٢- ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة - والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان -

তরজমাঃ

৮২। কিয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবন লাভ, যাবতীয় কৃতকর্মের বিনিময় লাভ, আমল নামা পেশ হিসেব-নিকেশ, সব আমল নামা পাঠ, পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের সাজা, পুল-সিরাত এবং মীজান (ন্যায়-অন্যায় পরিমাপের দাঁড়ি পাল্লা) এসব কিছুর সত্যতায় আমরা বিশ্বাস পোষণ করি।

(পুনরুজ্জীবন লাভের মানে হলো, কিয়ামতের দিন সবার সশরীরে পুনরুত্থান ঘটা, হাশরের ময়দানে জমায়েত হওয়া এবং দুনিয়ার এই শরীরকেই জীবন দান করা)

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ - التوبه -٧٣

হে নবী, আপনি কাফের ও মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করুন। (আত্তাওবা-৭৩)

জিহাদের উদ্দেশ্য ফিতনা দমন এবং কালেমার ঝান্ডা সর্বোচ্চে উত্তোলন-

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ - فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ -الانفال - ٣٩

হে ঈমানদাররা, যতক্ষণ ফিতনা দমিত না হবে এবং দ্বীন ও আনুগত্য পুরোপুরি একমাত্র আল্লাহর জন্য না হয়ে যাবে, ততক্ষণ কাফের-মুশরিকদের সাথে লড়াই কর। (আনফাল-৩৯)

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ - بخارى - مسلم -

আমি আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ গোটা মানব গোষ্ঠী সাক্ষ্য না দেবে যে, আল্লাহ

٨٣- والجنة والنار مخلوقتان - لاتفنيان أبدًا ولاتبيدان فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق - وخلق لهما أهلاً فمن شاء منهم الى الجنة فضلاً منه - ومن شاء منهم الى النار عدلاً منه - وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر الى ما خلق له -

তরজমাঃ

৮৩। বেহেশ্‌ত ও দোযখ দু'টিই সৃষ্টি করা হয়েছে। কখনো এ দু'টি বিলীন ও বিনাশ হবেনা। চিরদিন ও অনন্তকাল ব্যাপী বিদ্যমান থাকবে। অন্যান্য মাখলুক সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্‌ তায়ালা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং পরে সৃষ্টি করেছেন জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকেও। এখন যাদেরকে তিনি চাইবেন, জান্নাত দেবেন এবং এটা হবে তাঁর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী। আর যাদেরকে ইচ্ছা, জাহান্নামে পাঠাবেন এবং এটা হবে তাঁর ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে। যার জন্য যে কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে, সে ওই কাজই করবে এবং যার জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, পরিণতিতে সেটাই হবে তার গন্তব্যস্থল।

ছাড়া আর কোন ইলাহ্‌ নেই, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল, এবং নামায কায়েম না করবে, যাকাত না দেবে, ততক্ষণ তাদের সাথে যেন লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যাই। যখন তারা তা করলো, তখন তারা আমার থেকে তাদের রক্ত, প্রাণ ও ধনমাল বাঁচালো। তবে ইসলামের হক ও বিধান মতে দন্ড দিলে আলাদা কথা। আর তাদের হিসেব-নিকেশ আল্লাহর উপর। (বুখারী-মুসলিম, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্‌, আহমাদ, এটি মুতাওয়াতির হাদীস)

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এর মানে, কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদের ধারা অক্ষুন্ন থাকবে।

عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ....

٨٤- والخير والشر مقدران على العباد -

٨٥- والاستطاعة التى يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذى لايجوز أن يوصف المخلوق به فهى مع الفعل - واما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الالات فهى قبل الفعل - وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة - ٢٨٦)

তরজমাঃ

৮৪। ভাল-মন্দ দুটোই মানুষের তাকদীরে নির্ধারিত হয়ে আছে।

৮৫। শক্তি-সামর্থ্য দু'রকম। এর একটি হলো সেই শক্তি, যদ্বারা কোন কর্ম অপরিহার্য রূপে সংগঠিত হয়, যায় আল্লার তৌফীক বা সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত। এর সাথে মাখলুককে সংশ্লিষ্ট ও বিশেষিত করাই জায়েজ নেই। এই শক্তি কার্যের সাথেই সংশ্লিষ্ট। আর স্বাস্থ্য, সাধ্য, ক্ষমতা এবং উপায়-উপকরণের সুস্থতা ও কার্যকারিতার দিক দিয়ে যে শক্তি-সামর্থ্য, সেটি কর্মসাধনের আগেই পাওয়া যায়। আল্লার সম্বোধন বান্দাদের প্রতি এই শক্তি-সামর্থ্যের সাথেই সংশ্লিষ্ট। যেমন- তিনি ইরশাদ করেনঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا الأ وُسْعَهَا -

তরজমাঃ আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে অধিক দায়িত্ব দেন না। (আল-বাকারা- ২৮৬)

হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের উপর বিজয়ী থেকে সংগ্রাম করে যাবে। .... (মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ

٨٦- وافعال العباد خلق الله وكسب من العباد -

৮৬। বান্দাদের যাবতীয় ক্রিয়া কর্ম আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টি এবং বান্দাদের অর্জন। (অর্থাৎ মানুষের শ্রম ও চেষ্টা-সাধনার ফলে কোন কিছু বাস্তব রূপ লাভ করে। তবে আল্লার ইচ্ছায় তা হয়ে থাকে)।

نفاق -

যে মুসলমান এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলো যে, না কখনো সে আল্লাহ্‌র পথে লড়াই-সংগ্রাম করেছে, আর না অন্তরে এর সংকল্প করেছে, মুনাফিকীর বিভিন্ন শাখার এক শাখার উপর তার মৃত্যু হয়েছে। (মুসলিম)

ইমাম কুরতুবী (রঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো- জিহাদের দৃঢ় সংকল্প ও আকাংক্ষা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

اذا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ والدِّرهم وتَبَايَعُوْا بِالعَيْنِ واتَّبَعُوا أَذْنَابَ بَقَرٍ وتَرَكُوْا الجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَنْزَلَ اللهُ بِهِمْ بَلاَءً فَلَمْ يَرْفَعْهُ حَتّى يُرَاجِعُوْا -

অর্থাৎ মুসলমানরা যখন অর্থ-বিত্তের পেছনে পড়ে যাবে, ছুঁড়ো দামে বেচাকেনায় লিপ্ত হয়ে যাবে, চাষাবাদে লেগে যাবে আর জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাদের উপর নানারূপ বিপদ মুসীবত নাযিল করবেন, জিহাদ ত্যাগের এই গুনাহ্ থেকে যতদিন তারা ফিরে না আসবে, ততদিন এসব বিপদ মুসীবত আল্লাহ্ তাদের থেকে তুলে নেবেন না।(আবু দাউদ)

শাহ্ওয়ালী উল্লাহ্ (রঃ) এ হাদীসেরই ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে-

اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالخلافة العامة وغلبة دينه على سائر الاديان لايتحقق الابالجهاد واعداد الالة فاذا تركوا الجهاد واتبعوا اذناب البقر احاط بهم الذل وغلب اهل سائر الاديان - حجة الله البالغة -ج - ٢ صـ١٧٢

٨٧- ولم يكلفهم الله تعالى إلا مايطيقون ولايطيقوا إلا ماكلفهم وهو تفسير لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ - نقول لاحيلة لأحد ولاحركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله - ولاقوة لأحد على اقامة طاعة الله والثبات عليها الابتوفيق الله -

তরজমা ঃ-

৮৭। আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাদের উপর-তাদের সাধ্যে যতটা কুলায় কেবল ততটা দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর চাপিয়েছেন। আর তিনি তাদের যে আদেশ করেছেন বা তাদের উপর যে পরিমাণ দায়িত্বের বোঝা চাপিয়েছেন তার চেয়ে বেশী বোঝা বহনের সাধ্য বা ক্ষমতা তাদের নেই। এটাই

তরজমা ঃ- জেনে রেখো, নিশ্চয় নবী করিম (সাঃ) সার্বজনীন ও ব্যাপক খেলাফত এবং দুনিয়ার সমস্ত দীন-ধর্ম ও মতবাদের উপর দীন ইসলামের বিজয়ের দায়িত্ব সহ প্রেরিত হয়েছেন। তা জিহাদ ও যুদ্ধার প্রস্তুত করা ছাড়া কিছুতেই বাস্তবায়িত হতে পারেনা। মুসলমানরা যখন জিহাদ ছেড়ে দেবে এবং গরুর পেছনে অর্থাৎ চাষাবাদে লেগে যাবে, অপমান ও লাঞ্ছনা তাদের কে ঘিরে ফেলবে এবং দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও মতবাদীরা তাদের উপর বিজয়ী হয়ে পড়বে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, জিলদ-২ পৃষ্ঠা ১৭৩)

অতএব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জিহাদ করতে হবে। কোন সময়ের জন্য জিহাদ বন্ধ করা যাবেনা।

ইসলামী রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকলে জিহাদ ফরযে কেফায়া। যত সংখ্যক লোকের প্রয়োজন, তারা জিহাদ করলেই অবশিষ্ট সবার তরফ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। না হলে সবাই গুনাহ্‌গার হবে। তবে তিন সময় জিহাদ ফরযে আইন (১) যখন দু'দলে লড়াই শুরু হয়, (২) যখন শত্রু বাহিনী ইসলামী রাষ্ট্র আক্রমন করে এবং তা ঘেরাও করে ফেলে। (৩) যখন ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার সাধারণ ডাক (نفير عام) দিবেন কিংবা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً - توبة

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

এর আসল ব্যাখ্যা- ।

এ কথার তাফসীর এবং ব্যাখ্যায় আমরা এটাই বলে থাকি- মহান আল্লাহর মদদ ও সাহায্য ছাড়া কারও কোন উপায় নেই। নড়াচড়া করারও কোন ক্ষমতা নেই এবং কেউ আল্লাহর নাফরমানি থেকে বিরত থাকতেও সমর্থ হয় না। অনুরূপ আল্লাহ্ তায়ালার তৌফীক ভিন্ন কেউ তাঁর আনুগত্য প্রতিষ্ঠার এবং এর উপর অটল থাকার সাধ্য কারো নেই।

'দ্রুত বেরিয়ে পড়, হালকা ভাবে হোক বা ভারীভাবে । (আত-তাওবা)

রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا -

"যখন তোমাদের প্রতি সাধারণ ডাক দেয়া হয়, তখন জিহাদে বেরিয়ে পড়"

ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের উপর যদি চারদিক থেকে শত্রুদের হামলা শুরু হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ লোক মুসলমান হয়, তখন সাধারণ ডাক দেয়ার কেউ না থাকলেও যদি সাধারণ ডাকের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায় তখন সবার উপর জিহাদ করবে আঈন হয়ে যায়। (শাহওয়ালী উল্লাহ্ (রঃ), মুসাওয়া, শরহে মুয়াত্তা, ২য় জিলদ, পৃঃ- ১২৯)

টীকা ঃ ৮৭। কোন কোন আলেমের মতে শেষের কথাটি ঠিক নয়। তারা বলেন, বরং আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের উপর যতটা (আদেশ নিষেধ পালনের) বোঝা চাপিয়েছেন, তার চেয়ে বেশী বোঝা বহনের ক্ষমতা তিনি মানুষকে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি অশেষ দয়াবান ও মেহেরবান। তাই তিনি তাদেরকে বোঝা বহনের যতটা ক্ষমতা দিয়েছেন, তার চেয়ে কম বোঝা তাদের উপর চাপিয়েছেন। তাদের উপর দীনকে সহজতর করে দিয়েছেন। দীনের ব্যাপারে তাদের উপর কোন রূপ সংকীর্ণতা ও জটিলতা আরোপ করেননি। যেমন হাদীসে প্রমাণিত ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে সারা বছর রোযা রাখার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। রাসূল (সাঃ) রোযার সংখ্যা যত কমাতে বললেন, তিনি তার চেয়েও বেশী শক্তি রাখেন বলে জানালেন। অবশেষে রাসূল (সাঃ) তাঁকে মাসে তিনদিন রোযা রাখতে বললেন।

৮৮- وكل شئ يجرى بمشيئة الله تعالىٰ وعلمه وقضائه وقدره - غلبت مشيئته المشيئات كلها - وغلب قضاؤه الحيل كلها - يفعل مايشاء وهو غير ظالم أبداً - تقدس عن كل سوء وحين - وتنزه عن كل عيب وشين - لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ -(الانبياء -٢٣)

তরজমা ঃ

৮৮। সব কিছুই আল্লাহ্ তায়ালার জ্ঞাতে ও ইচ্ছায় এবং তাঁর তাকদীর ও সিদ্ধান্তেই চলছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অন্য সব ইচ্ছার উপর বিজয়ী ও প্রবল। যাবতীয় চাল ও কলা কৌশলের উপর তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তিনি যা চান, তা করেন। তবে তিনি কখনও যালিম ও অনাচারী নন, (কারো উপর কখনো কোন যুলম করেননা, তিনি চিরকালব্যাপী ইনসাফকারী ও ন্যায় বিচারক।) তিনি সব রকম মন্দ ও ধ্বংস থেকে পবিত্র এবং সব প্রকার দোষ-ত্রুটি ও অবমাননা থেকে মুক্ত।

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ - (الانبياء - ٣٢)

'তিনি যা করেন, সে জন্য (কারো কাছে) তাঁকে কোনই জবাবদিহি করতে হয়না। আর অন্য সকলকেই (তাঁর কাছে) জবাবদিহি করতে হবে।"(আল-আম্বিয়া-২৩)

قال قلتُ يارسول الله إنى أجدُ قوةً - قال صم صوم نبى الله داود - ولا تزد عليه - .... كان يصوم يوما ويفطر يوما - رواه احمد وفقه السنة وغيرهما -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আরও বেশী শক্তি রাখি। রাসূল (সাঃ) থেকে বললেন, তবে আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) এর রোযার মত রোযা রাখ। এর বেশী রেখনা। ———— তিনি

٨٩- وفى دعاء الاحياء وصدقاتهم منفعة للأموات -

٩٠- والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضى الحاجات-

٩١- ويملك كل شئ ولايملكه شئ ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من اهل الحين -

তরজমাঃ

৮৯। জীবিত লোকদের দোয়া ও দান-সদকায় মৃতদের উপকার হয়।

৯০। একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই সকলের সব দোয়া কবুল করেন এবং সকলের সব অভাব ও প্রয়োজন পূরণ করেন (আর কেউ নয়)।

৯১। আল্লাহ্ তায়ালাই সব কিছুর মালিক, সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিকারী। তাঁর কোন মালিক নেই। চোখের পলক মাত্রের জন্যও অর্থাৎ ক্ষণান্তরেও আল্লাহ্ তায়ালা থেকে মুখাপেক্ষীহীন হওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কেউ যদি পলক মাত্রও এবং ক্ষণান্তরেও আল্লাহ্ তায়ালা থেকে মুখ ফিরান, সে অবশ্যই কুফরী করল এবং যারা ধ্বংস হয়েছে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন ভাঙতেন (অর্থাৎ একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন)। আহমাদ, ফিকহুস সুন্নাহ প্রভৃতি।

এতে প্রমাণিত হল, আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের উপর যতটা বোঝা চাপিয়েছেন, মানুষকে তার চেয়ে বেশী বোঝা বহনের ক্ষমতা দিয়েছেন।

টীকা ঃ ১০২। সব মুসলমান এক জামায়াত। সবার ঐক্যবদ্ধ থাকা ইসলামের বিধান। বিচ্ছিন্ন জীবন ইসলামে নিষিদ্ধ। বিভেদ ও দলাদলি শাস্তিযোগ্য।

জামায়াত মানে দলবদ্ধ হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, উম্মাহর সংঘবদ্ধতার আওতায় আসা।

শরীয়াতের পরিভাষায় ক. কোন উদ্দেশ্য সাধনে মুসলিম উম্মার একতাবদ্ধ ও

٩٢- والله تعالي يغضب ويرضى - لاكأحد من الورى -

٩٣- ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم- ولانفرط في حب احد منهم - ولانتبرأ من احد منهم - ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكر هم إلابخير - وحبهم دين وإيمان وإحسان - وبغضهم كفرو نفاق وطغيان -

তরজমাঃ

৯২। আল্লাহ্ তায়ালা রাগ ও গোস্বাও হন এবং খুশী ও সন্তুষ্ট ও হন। তবে কোন সৃষ্টি ও মাখলুকের মত নয়।

৯৩। আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব সাহাবীকেই ভালবাসি। তবে কোন সাহাবীর ভালবাসায় সীমালংঘন বা বাড়াবাড়ি করিনা এবং সাহাবীগণের কারো সাথে বৈরী ভাবও রাখিনা। যারা সাহাবায়ে কেরামের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে কিংবা অনুত্তম ও অসৌজন্য ভাবে তাঁদের উল্লেখ করে, আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি। আমরা উত্তম ও সৌজন্য মূলক পন্থায় ছাড়া অন্য কোন ভাবে সাহাবায়ে কেরামের উল্লেখ করিনা। সাহাবায়ে কেরামকে ভালবাসা দীন, ঈমান ও ইহসান বা কল্যাণের বিষয়। আর তাঁদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা কুফরী, মুনাফিকী এবং সীমালংঘন ও বিদ্রোহের কাজ।

দলবদ্ধ হওয়াকে জামায়াত বলা হয়।

৫. জামায়াত বলতে মুসলমানদের জামায়াতকেই বোঝায়, যখন তারা একজন নেতা বা আমীরের অধীনে দলবদ্ধ হয়। (ইমাম শাতেবী (রঃ) আল-ই'তিসাম, ২/২৬০-৬৫)

হাফেজ ইবনে হাজার (রঃ) ও এ সংজ্ঞা সমর্থন করেছেন। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক কর্মসূচী থাকবে, নেতা থাকবেন, তাঁর আনুগত্য থাকবে, এসব নীতিমালার প্রতি বিশ্বাস থাকবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাবে। এসব মিলে হলো জামায়াত।

٩٤- ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً لأبى بكر الصديق رضى الله عنه تفضيلاً له وتقديما على جميع الامة - ثم لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ثم لعثمان بن عفان رضى الله عنه ثم لعلى بن ابى طالب رضى الله عنه -وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون -

তরজমাঃ

৯৪। আমাদের সুপ্রমাণিত দৃঢ় অভিমত হল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর গোটা উম্মাতের মধ্যে ফযীলত, বুজর্গী ও মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্বের কারণে (মুসলিম জাহানের) খলীফা হওয়ার জন্য প্রধান যোগ্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), অতঃপর হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ), এরপর হযরত উসমান (রাঃ), তারপর হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)। এরা সবাই খোলাফায়ে রাশেদীন এবং হিদায়াত প্রাপ্ত ও সত্যপন্থী নেতা ছিলেন।

কুরআন বলছে ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَاتَفَرَّقُوْا- ال عمران- ايت - ١٠٢

তরজমা ঃ- তোমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যেওনা। (আলে ইমরান-১০৩)

وَلَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - ال عمران - ايت - ١٠٥

তরজমা ঃ- এবং তোমরা সে সব লোকের মতো হয়ে যেওনা, যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ (বিধান)

٩٥- وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة - نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق- وهم : ابوبكر - وعمر- وعثمان - وعلى- وطلحة - والزبير - وسعد - وسعيد - وعبد الرحمن بن عوف - وابو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الامة - رضى الله عنهم اجمعين -

তরজমাঃ

৯৫। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাঁদেরকে বেহেশতবাসী হওয়ার সুখবর দান করেছেন, তাঁর সাক্ষ্য ও ঘোষণা মুতাবিক আমরাও তাঁদের বেহেশতী হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছি। রাসূল (সাঃ) এর কথা নির্ঘাত সত্য। জান্নাতের সুখবর প্রাপ্ত সেই দশজন সাহাবী হলেন ঃ

১। হযরত আবুবকর (রাঃ) ২। হযরত উমার (রাঃ) ৩। হযরত উসমান (রাঃ) ৪। হযরত আলী (রাঃ) ৫। হযরত তাল্‌হা (রাঃ) ৬। হযরত যুবায়ের (রাঃ) ৭। হযরত সা'আদ (রাঃ) ৮। হযরত সা'ঈদ (রাঃ) ৯। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) এবং ১০। হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রাঃ)। এই শেষের জন আমিনুল উম্মাত (উপাধি প্রাপ্ত) ছিলেন। রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। যারা এরূপ আচরণ অবলম্বন করে নিয়েছে, তাদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। "(আলে ইমরান, আয়াত ১০৫)

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি জিনিসের নির্দেশ দিচ্ছি। আল্লাহ আমাকে এ গুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। জামায়াত বদ্ধ হয়ে থাকা, (নেতার কথা) শোনা ও (তার) আনুগত্য করা, হিজরত এবং আল্লার পথে জিহাদ করা। কেননা, যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বেরিয়ে যাবে (অর্থাৎ দূরে

٩٦- ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق -

٩٧- وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر - وأهل الفقه والنظر لايذكرون إلابالجميل - ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل -

তরজমাঃ

৯৬। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীবৃন্দ এবং তার নিষ্কলুষ পাক পবিত্রা বিবিগণ ও নির্মল নেক সন্তানদের প্রসংগে সব রকম নিন্দাবাদ ও নোংরামী পরিহার করে শোভনীয়, মার্জিত ও সুন্দর পন্থায় কথা বলে, সে ব্যক্তি মুনাফেকী থেকে মুক্ত।

৯৭। প্রথম যুগের উলামায়ে সালফে সালেহীন, তাবেয়ীন এবং পরবর্তীকালে তাদের পদাংক অনুসরণ কারী নেক-বুজর্গ মুহাদ্দিসীন, ফকীহবৃন্দ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদগণের উল্লেখ সুন্দর ও মার্জিত ভাবে করা উচিত। যারা অশালীনভাবে তাঁদের উল্লেখ করে, তারা সত্য ও সরল পথ বিচ্যুত।

সরে যাবে) সে যেন ইসলামের রশিকে গর্দান থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। পুনরায় ফিরে না আসা পর্যন্ত------। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, সে ব্যক্তি যদি নামায পড়ে এবং রোযা রাখে তবুও? তিনি বললেন, হাঁ যদিও রোযা রাখে এবং নামায পড়ে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলমান। "হারেস আ-রাশী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মুসনাদে আহমাদ ৪/২০২ হাদীসটি এরূপ-

قال رسول الله صلى عليه وسلم وأنا آمركم ...... يخمس - الله امرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله - فإن من خرج من الجماعة قيد

٩٨– ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام – ونقول : نبي واحد أفضل من جميع الأولياء –

٩٩– ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم –

١٠٠– ونؤمن بأشراط الساعة :من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء – ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها – وخروج دابة الأرض من موضعها –

তরজমাঃ

৯৮। আমরা কোন ওলী বা বুজর্গ ব্যক্তিকে কোন নবীর উপর মর্যাদা দেইনা। বরং আমাদের মতে, একজন নবী সমস্ত আউলিয়ার চেয়েও উত্তম এবং অধিক মর্যাদাবান।

৯৯। আউলিয়াদের কেরামাত আমরা বিশ্বাস করি। তবে শর্ত হলো, তা বিশ্বস্ত সূত্র ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনার ভিত্তিতে সত্য বলে প্রমাণিত হতে হবে।

১০০। আমরা কিয়ামাতের আলামত সমূহ ও শর্তগুলোকে বিশ্বাস করি। সে সব আলামতের মধ্যে রয়েছে দাজ্জালের আবির্ভাব, আসমান থেকে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের (আঃ) অবতরণ, পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়, এবং নিজেদের নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে 'দাব্বাতুল আরদ' (জমীনের এক প্রকার বিকট জন্তু) এর উদ্ভব।

شبــــر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الأن يرجع ....قالوا يارسول الله وإن صلى وصام ؟ قال وإن صام وصلى وزعم انه مسلم)

রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

ويد الله مع الجماعة – ترمذى – ٤٦٦\٤

١٠١– ولانصدق كاهنًا ولاعرافًا – ولامن يدعى شيئا يخالف الكتاب والسنة واجماع الأمة –

١٠٢– ونرى الجماعة حقًا وصوابًا – والفرقة زيغًا وعذابًا –

١٠٣– ودين الله فى الارض والسماء واحد – وهو دين الإسلام – قال الله تعالى : إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ – (ال عمران – ١٩) وقال تعالى : وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا – (المائدة – ٣)

তরজমাঃ ১০১। আমরা গনক বা জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করিনা এবং এমন কোন ব্যক্তির কথাও বিশ্বাস করিনা যে আল্লাহর কিতাব, নবীর সুন্নাহ ও উম্মাতে মুসলিমার ইজমা বা ঐকমত্যের বিপরীত কিছু দাবি করে।

১০২। আমরা 'আল-জামায়াত' অর্থাৎ গোটা উম্মাহর একটি মাত্র জামায়াতে সংহত ও দলবদ্ধ হয়ে থাকাকে বরহক ও সঠিক মনে করি এবং বিভেদ, অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করাকে বক্রতা, গোমরাহী ও শাস্তিযোগ্য বলে গন্য করি।

১০৩। আসমান ও যমীনে আল্লাহ তায়ালার দীন শুধু একটি। আর সেটি হলো 'দীন-ইসলাম। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ (ال عمران – ١٩)

তরজমা ঃ- নিশ্চয় আল্লার নিকট একমাত্র দীন হলো ইসলাম। (আলে ইমরান-১৯)

মহান রাব্বুল আলামীন আরো বলেছেন ঃ

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا (المائدة – ٣)

তরজমা ঃ- 'এবং আমি তোমাদের জন্য দীন (জীবন বিধান) হিসেবে একমাত্র ইসলামকেই মনোনীত করলাম।' (আল-মায়েদা - ৩)

আল্লাহর হাত জামায়াতের সাথে। (তিরমিযি)

হযরত উমার (রাঃ) বলেছেন,

...... إنه لااسلام الابجماعة ولاجماعة الابامارة ولاإمارة

١٠٤-وهو بين الغلو والتقصير-وبين التشبيه والتعطيل - وبين الجبر والقدر - وبين الأمن واليأس -

তরজমা ঃ

১০৪। ইসলাম অতিরঞ্জন ও সংকোচন, তাশবীহ ও তা'ত্বীল, জবর ও কদর এবং নিশ্চিন্ততা ও নৈরাশ্যের মাঝামাঝি মধ্য পন্থী একটি দীন বা জীবন ব্যবস্থা।

الابطاعة - (الدارمي ١\٧٩) عن تميم الدارمي موقوفا)

জামায়াত ছাড়া ইসলাম নেই, আমীর বা নেতা ছাড়া জামায়াত নেই, আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্বেরও কোন অর্থ নেই। (দারেমী, ১/৭৯)

রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

فمن رأيتموه فارق الجماعة أويريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه فإن يدالله مع الجماعة (النسائى ٧\٩٢ ومسلم ٢. وابوداود ٤. واحمد ٤)

'অতঃপর যাকেই তোমরা দেখবে যে সে জামায়াতে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছে কিংবা মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মাতের কোন বিষয়ে ভাঙ্গন ধরানোর ইচ্ছা করে, সে যে কেউই হোকনা কেন, তাকে তোমরা হত্যা করবে। কেননা, আল্লার হাত জামায়াতের সাথে রয়েছে। (নাসাঈ, মুসলিম, আবুদাউদ, আহমাদ)

উপরের এসব আয়াত ও হাদীস মুসলিম উম্মার জীবনে জামায়াত বদ্ধ থাকার আবশ্যকতাকে সপ্রমাণ করছে। বর্তমানে দুনিয়াতে 'আল-জামায়াত' বিশ্বাসে আছে, বাস্তবে নেই। তাই উম্মাহর মধ্যে ঐক্যও নেই। এজন্য জগতে মুসলমানরা আজ দুর্বল ও লাঞ্ছিত। সুতরাং পূর্ব গৌরব, শ্রেষ্ঠত্ব, শক্তি, মান-মর্যাদা পেতে হলে [illegible] নিকে ফিরে যেতে হবে।

١٠٥- فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطنا - ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه -

ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان - ويختم لنا به - ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة - والمذاهب الردية مثل : المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة - وحالفوا الضلالة - ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء - وبالله العصمة والتوفيق -

তরজমাঃ

১০৫। উপরে যত কথা বর্ণনা করা হয়েছে, জাহেরী ও বাতেনী ভাবে তা সবই হলো আমাদের দীন এবং আমাদের আকীদা ও বিশ্বাস। উল্লিখিত ও বর্ণিত এই দীন ও এসব আকীদা-বিশ্বাসের যারা বিরোধী, আমরা আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে তাদের প্রত্যেকের সাথে সম্পর্ক হীনতা ও সম্পর্ক ছিন্নতার কথা ঘোষণা করছি এবং আল্লাহ্ পাকের নিকট দোয়া ও মুনাজাত করছি তিনি যেন আমাদেরকে ঈমানের উপর অটল ও কায়েম রাখেন, এই ঈমানের উপরই আমাদের (জীবনের) পরিসমাপ্তি ঘটান, প্রবৃত্তির নানাবিধ খায়েশ ও লোভ লালসা, বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ ও [illegible] যাবতীয় বিকৃত ও বাতিল দল

উপদল থেকে বাঁচান ও হেফাজত করেন। যেমন- মুশাব্বিহা, মু'তাযিলা (মুয়াত্তিলা), জহ্‌মিয়া, জবরিয়া, কদ্‌রিয়া প্রভৃতি - যারা সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী এবং ভ্রান্তি ও গোমরাহীর পক্ষাবলম্বী এসব ভ্রান্তদলের সাথী ও অনুরাগী। এদের সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই। কেননা, আমাদের দৃষ্টিতে এরা চরম গোমরাহ, বিকৃতমনা ও নিকৃষ্টতম।

হেফাজত ও তৌফীক একমাত্র আল্লারই হাতে।

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه
وسلم والحمد لله رب العلمين -

ইমাম আশারী (রঃ) তাঁর লেখায় এই গুরুত্বের দিকেই ইংগিত করেছেন। অথচ তখন ইসলামী রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল। কয়েকটি গোমরাহ ফেরকা ছাড়া গোটা উম্মাহ্ ঐক্যবদ্ধ ছিল। বর্তমানে জামায়াত, ইসলামী রাষ্ট্র ও খেলাফত কায়েম না থাকায় যাবতীয় কুফল মুসলিম উম্মাহ্ এক সাথে ভোগ করছে।

অবশ্য বর্তমানে দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে সব ইসলামী জামায়াত কাজ করছে, এগুলো আল-জামায়াত নয়, জামায়াত।

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْئٍ - إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ - الانعام - ايت ١٥٩

তরজমা ঃ- যারা নিজেদের দ্বীনকে খন্ড বিখন্ড করে নিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, (হে নবী,) তাদের সাথে নিশ্চয় তোমার কোনই সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আল্লার নিকটই সোপর্দ রয়েছে। তিনিই তাদেরকে (পরকালে) অবহিত করে দিবেন যে, তারা কি কি করেছে। (আল-আন-আম, আয়াত- ১৫৯)

এ আয়াতে সম্বোধন নবী করিম (সাঃ) কে করা হলেও সকল মুসলমানই

এই সম্বোধনের মধ্যে শামিল। সুতরাং যে ব্যক্তিই সত্যিকার দীন- ইসলামের অনুসারী হবে, সে এসব দলাদলি, ফেরকাবন্দী ও পরস্পরে ফতোয়াবাজি পরিহার করে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক জামায়াতী জীবন যাপন করাকে একান্ত কর্তব্য মনে করবে। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ-

فانه من فارق الجماعة شبرافمات فميتته جاهلية
- بخاری ومسلم -

যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেছে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করেছে, তার এই মৃত্যু জাহেলী মৃত্যু হয়েছে। বুখারী, মুসলিম।

●●●

সমাপ্ত

ইসলামে বিভিন্ন ফেরকার সূচনা ও পরিচয়

খেলাফতে রাশেদার পর রাজতন্ত্র যখন শুরু হয়- তখন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে নানারূপ ফেরকার উদ্ভব ঘটে। ইসলাম পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা নয়। খেলাফতে রাশেদার সময় ধর্ম ও রাজনীতি একই কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। সব রকম মতভেদ ও মতবিরোধের ফয়সালা একই স্থান থেকে আসতো। কিন্তু রাজতন্ত্রের যুগে ধর্মীয় মতবিরোধ দূর করার মত সেরূপ সর্বজনমান্য ও ক্ষমতা সম্পন্ন ফয়সালাকারী কোন প্রতিষ্ঠান ছিলনা। ফলে শুরু হয় নানা মতবিরোধ, দেখা দেয় অনেক ফেতনা, সৃষ্টি হয় অসংখ্য ফেরকার। পরে এসব ফেরকা ক্রমশঃ রাজনৈতিক রূপ বাদদিয়ে নিছক ধর্মীয় রূপ ধারণ করতে থাকে। আস্তে আস্তে এসব ফেরকা ইসলামের মূল আকীদা-বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যায় এবং নিজস্ব চিন্তাধারাকে দার্শনিক রূপ দানের প্রয়াস পায়। এসব অসংখ্য ফেরকার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি হলো শিয়া, খারেজী, মুতাযিলা, মুরজিয়া, কাদরিয়া, জবরিয়া, মুশাব্বিহা, মুয়াত্তিলা, জহমিয়া প্রভৃতি।

সংক্ষেপে এসব ফেরকার মতবাদ তুলে ধরা হলো।

শিয়া মতবাদ

হযরত আলী (রাঃ) এর ভালবাসায় এরা অতি বাড়াবাড়ি করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরপর খেলাফতের জন্য তাঁকে যোগ্যতম ব্যক্তি মনে করে এবং খেলাফতকে তাঁর হক বা অধিকার হিসেবে বিশ্বাস করে।

তারা খেলাফতে নয়-ইমামতে বিশ্বাসী। তাদের মতে, ইমাম নিযুক্ত করা নবী করীম (সঃ) এর দায়িত্ব। জনগণের এখানে করণীয় কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-ই হযরত আলী (রাঃ) কে তাঁর পরে ইমাম মনোনীত করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রাঃ) কে, তিনি হযরত হোসাইন (রাঃ) কে এভাবে প্রত্যেক পূর্ববর্তী ইমাম তাঁর পরবর্তী ইমামকে নিযুক্ত করে গেছেন। এভাবে বারজন ইমাম নিযুক্ত হয়েছেন। সর্বশেষ ইমাম গোপন আছেন। ইমাম মেহদী (আঃ) নামে শেষযুগে তাঁর আবির্ভাব হবে। হযরত আলী (রাঃ) এর

বংশধর ভিন্ন আর কেউ ইমাম হতে পারবেনা। সব ইমাম মা'সুম বা নিষ্পাপ। খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম তিন খলীফাকে তারা স্বীকার করেনা। বরং তাঁদেরকে জবর দখলকারী বলে মনে করে। স্বল্প সংখ্যক সাহাবীকে সাহাবী বলে স্বীকার করে। রাসূল (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হোসাইন (রাঃ) কে ছাড়া আর কাউকে আহলে বায়েত স্বীকার করেনা। তাদের মতে, তাকিয়া অর্থাৎ প্রয়োজনে আসল উদ্দেশ্য গোপন করে মনে যা নেই মুখে তা প্রকাশ করা জায়েজ, কোন কোন সময় ফরয।

তারা মুত'আ বিয়ে অর্থাৎ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিয়ে করাকে জায়েজ মনে করে।

অযু করার সময় তারা পা মুসেহ করা ফরয মনে করে।

শিয়াদের নিকট যে কোন রকম ইজমা শরয়ী দলীল নয়। তবে ইজমা যদি কোন ইমামের রায় প্রকাশ করে কিংবা যাঁরা ইজমা সাব্যস্ত করবেন, কোন ইমাম যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকেন সে ইজমা শরয়ী দলীল বলে গৃহীত হবে।

খারেজী

মুসলিম উম্মাহর মূল স্রোতধারা ও ইসলামের সঠিক আকীদা-বিশ্বাস থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে এদেরকে খারেজী বলা হয়। এরা তাদের আকীদা-বিশ্বাসে অত্যন্ত চরমপন্থী ও আন্তরিক ছিল। এরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এবং নিজেদের বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিল।

সিফফীন যুদ্ধের সময় হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর বিরোধ মীমাংসাও সালিস নিযুক্তিতে সম্মত হওয়াকে কেন্দ্র করে এদলের উদ্ভব ঘটে। তাদের মতে, 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ফয়সালাকারী নেই।' এটিই ছিল তাদের দীন ও শ্লোগান। এর বিরোধীরা কাফের। ভিন্নমত পোষণকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং যালেম শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণার তারা সমর্থক।

তাদের মতে, যে কোন গুনাহ্ করলে লোক কাফের হয়ে যায়। তাই হযরত উসমান (রাঃ), জামাল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ এবং সিফফীনের যুদ্ধকালে সালিসে জড়িত ও সম্মত সবাই কাফের। সাধারণ মুসলমানরা যেহেতু উপরোক্ত সবাইকে কাফের মনে করে না, বরং নেতা মানে। তদুপরি তারা নিজেরাও গুনাহমুক্ত নয়, একারণে সর্বসাধারণ মুসলমানরাও কাফের। উপরে উল্লেখিত

সাহাবীগণকে তারা কাফের বলতো, প্রকাশ্যে লানত দিত এবং গালি গালাজ করতো।

তারা মনে করে, সাধারণ মুসলমানদের সকলের স্বাধীন মতামত এবং ইনসাফের ভিত্তিতেই খলীফা নিযুক্ত হবেন। কুরাইশী এবং অ-কুরাইশী সবাই খেলাফতের যোগ্য। খলীফা ন্যায় ও কল্যাণচ্যুত হলে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাঁকে পদচ্যুত করা এবং পারলে হত্যা করাও ওয়াজিব।

তারা কুরআনকেই কেবল ইসলামী আইনের উৎস মনে করতো। হাদীস ও ইজমার ক্ষেত্রে তাদের ভিন্ন মত ছিল।

সংখ্যায় ও শক্তিতে এদের বড় দল ছিল আযারেকা। এরা চরম গোঁড়াপন্থী ছিল। নিজেদের ব্যতীত অন্য সব মুসলমানকে মুশরিক ভাবতো এবং ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারাদিতে তাদের সাথে মুশরিক তুল্য আচরণ করতো।

এদের অন্যতম দল ছিল নাজদাত। তারা সামাজিক প্রয়োজন দেখা দিলেই কেবল খেলাফত বা ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি ছিল। না হয় তা নিষ্প্রয়োজন মনে করতো।

খারেজীদের মধ্যমপন্থী দল ছিল 'আবাদিয়া'। চিন্তা ও বিশ্বাসে এরা সাধারণ মুসলমানদের নিকটতর ছিল। তাই কোন কোন দেশে এরা আজও টিকে আছে। সাধারণ মুসলমানদের ব্যাপারে এদের মত হলো, তারা মুশরিকও নয়, মুমিনও নয়। তবে আল্লার নেয়ামত অস্বীকার করার কারণে কাফের। অ-খারেজী মুসলমানদের হত্যা করা হারাম এবং তাদের দেশ দারুত-তাওহীদ, তবে সরকারের কেন্দ্রস্থল কুফরীর ঘাটি। অ-খারেজী মুসলিমদের সাথে প্রকাশ্য যুদ্ধ জায়েজ এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত সবকিছু গনীমতের মাল, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য, বিয়ে-শাদী ও উত্তরাধিকার জায়েজ।

খারেজীদের মতে, খুলাফায়ে রাশেদার প্রথম দু'জনের খেলাফত বৈধ ছিল। হযরত আলী (রাঃ) কে দেখামাত্র তারা শ্লোগান দিত, لَا حُكْمَ إِلَّا لِلّٰهِ আল্লাহ ছাড়া আর কোন ফয়সালাকারী নেই।' একদিন তিনি বলেন, "তাদের কথাটি সত্য। তবে বাতিল উদ্দেশ্যে তারা তা ব্যবহার করছে। সার্বভৌমত্ব এবং একচ্ছত্র রাজত্ব ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লার-একথা ঠিক। তবে তারা এর মানে করছে, আল্লাহ ছাড়া জনগণের আর কোন আমীর বা নেতাও নেই। অথচ আহলে সুন্নাতের মতে,

ভাল-মন্দ যেমন হোক, মুসলমানদের একজন নেতা হওয়া অতি জরুরী। যার শাসনের ছত্রছায়ায় ঈমানদাররা কাজ করবে। অমুসলিমরা উপকৃত হবে। মানব গোষ্ঠী আল্লাহর অনুগ্রহে স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। এই নেতা দুশমনদের সাথে লড়াই করবেন। গণীমতের মাল জমা করবেন, মানুষের চলাচলের রাস্তা সমূহের নিরাপত্তা বিধান করবেন, দুর্বলদেরকে শক্তিমান ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালীদের থেকে কিসাস বা খুনের বদলা নেয়ার শক্তি যোগাবেন। সৎ লোকেরা তার শাসনাধীনে স্বস্তি ও আরাম পাবে এবং অসৎ লোকদের থেকে নিষ্কৃতি পাবে।"[১]

সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও নেতা নির্বাচন প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করা সুন্নী আকীদার খেলাফ।

মু'তাযিলা

এ মতবাদের জনক ওয়াসিল ইবনে আতা, তার জন্ম মদীনায় ৮০ হিজরী ও মৃত্যু ১৩১ হিজরী সালে, উমাইয়া খলীফা হিশাম ইবনে আবদুল মালেকের আমলে। বনী উমাইয়াদের আমলে এ মতবাদের সৃষ্টি এবং আব্বাসী আমলে সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী ইসলামী ভাবধারার উপর এর প্রভাব সুদূর প্রসারী ছিল।

কথিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরীর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো, 'এযুগে কিছু লোক (খারেজীরা) বিশ্বাস করে যে, কবীরা গুনাহকারী কাফের। অন্য একটি সম্প্রদায়, বলে ঈমান থাকলে কোন গুনাহতেই কোন রকম ক্ষতি হয়না- যেমন কুফরী অবস্থায় ইবাদত করায় কোনই লাভ নেই। এক্ষেত্রে আপনার অভিমত কি?, তিনি জবাবটি চিন্তা করছিলেন। এমনি সময় ওয়াসিল উত্তর দিয়ে বললো, 'আমার মতে, কবীরা গুনাহকারী পুরো মুমিনও নয় এবং কাফেরও নয়। অতঃপর সে একটি থামের (স্তম্ভের) কাছে দাঁড়িয়ে হযরত হাসান বসরীর ছাত্রদের সামনে তার আকীদা ব্যাখ্যা করতে লাগলো, কবীরা গুনাহকারী এজন্য মুমিন নয় যে, মুমিন একটি গুণবাচক শব্দ। গুনাহগার হিসেবে সে কোন গুণের যোগ্য থাকেনা। অন্যদিকে সে কাফেরও নয়। কেননা সে কালেমায়

১। তারীখে আকায়েদ ও মুফাসসিরীন, গোলাম আহমদ হারিরী, পৃঃ- ৫০৩ ও আল মেলাল ওয়ান নেহাল, আল্লামা শাহরাস্তানী, জিলদ-১

বশ্বানী। এর সংগে সংগে অন্যান্য নেক [illegible] এরূপ ব্যক্তি যদি তওবা না করে মারা যায়, তবে সে চিরকাল [illegible] কারণ আখিরাতে কেবল দু'টি দলই থাকবে-জান্নাতী ও জাহান্নামী। তৃতীয় কোন দল হবেনা। অবশ্য এধরণের লোককে হালকা আযাব দেয়া হবে।[১]

তার কথা শুনে হাসান বসরীর রঃ বললেন, اعْتَزِلْ عَنَّا।

(আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা হয়ে যাও) এ কারণে তাকেও তার মতাবলম্বীদের কে মু'তাযিলা বলা হয়। এর মানে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দল।

উমাইয়া খলীফা ইয়াজীদ ইবনে ওলীদ ও মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ মুতাযিলা মত গ্রহণ করেন। আব্বাসী আমলে এ মতবাদের খুব উৎকর্ষ সাধিত হয়। সে যুগের হক্কানী আলেমগণ এই বাতিল মতবাদের বিরুদ্ধে প্রাণপন সংগ্রাম চালান। কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দিয়ে এই মতবাদের ভ্রান্তি তুলে ধরেন। এসময় মুতাযিলারা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ওয়াসিল বসরায় এবং বিশার ইবনে মু'তামির বাগদাদে নিজ নিজ দলের নেতৃত্ব দেন। এ দু'দলের চিন্তাধারায় অনেক পার্থক্য ছিল।

মুতাযিলাদের পাঁচ মূলনীতি

মুতাযিলাদের পাঁচটি মূলনীতি হলো-তাওহীদ, আদল, ওয়াদা, এবং ওয়ীদ, কুফর ও ইসলামের মধ্যবর্তী স্তর নির্ধারণ এবং আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার।

মুতাযিলাদের আকীদা

১। তাওহীদ- অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার কোন সাদৃশ্য ও নমুনা নেই। তিনি নিরাকার, তাঁর অনুরূপ কোন কিছুই নেই। তাঁর সাম্রাজ্যে তাঁর কোন প্রতিপক্ষ নেই। মানুষ যেসব ঘটনা ও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়, আল্লাহর পাক সত্তা এসব থেকে মুক্ত। তিনি কোন রকম ক্ষতি ও লাভালাভের মুখাপেক্ষী নন। তিনি স্বাদ সম্ভোগ, আনন্দ-উল্লাস, দুর্বলতা ও অক্ষমতা এবং কোন নারী স্পর্শ থেকে মুক্ত। তাঁর স্ত্রীর প্রয়োজন নেই, নেই কোন সন্তানের প্রয়োজন।[২]

মুতাযিলারা এই নীতির আলোকে

১। অধ্যাপক গোলাম আহমদ হারিরী, তারীখে তাফসীর ও মুফাসসিরীন, পৃ- ৫১২ উর্দু।
২। ইমাম আবুল হাসান আশআরী, মকালাতুল ইসলামিয়ীন।

ক) কিয়ামতের সময় আল্লাহ্ তায়ালাকে দেখা অসম্ভব বলে মনে করে। কেননা, তাতে আল্লার দেহ ধারণ ও দিক নির্ভরতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

খ) আল্লার গুণাবলী মূল সত্তা থেকে পৃথক নয়। নতুবা অনাদি সত্তায় সংখ্যাধিক্য ঘটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

গ) উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে তারা কুরআনকে সৃষ্ট (مخلوق) মনে করে। কেননা, তারা কালাম বা কথা- রূপ গুণকে আল্লার গুণ (صفات) বলে স্বীকার করে না।

২। আদল বা ইনসাফ এর মর্মার্থ হলো, আল্লাহ্ তায়ালা ফাসাদ, বিপর্যয় ও বিশৃংখলা পছন্দ করেননা। তিনি মানুষের কার্যাবলীকে সৃষ্টি ও করেন না। মানুষ আল্লার আদেশ সমূহকে বাস্তব রূপ দান করে এবং নিষেধ সমূহ থেকে বিরত থাকে। এটা সেই ক্ষমতার কারণে হয় যা আল্লাহ্ তায়ালা তাদের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ সেই নির্দেশই দেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন এবং সে জিনিসই নিষেধ করেন -যা তিনি খারাপ মনে করেন।

অতএব তাঁর আদিষ্ট প্রতিটি কাজ ভাল বলেই তিনি আদেশ করেছেন। এবং এসবই তাঁর নিকট পছন্দনীয়। আর তাঁর নিষিদ্ধ প্রতিটি কাজ মন্দ বলেই তিনি নিষেধ করেছেন। এবং এসব কখনো ভাল নয়। তিনি কখনো মানুষের উপর তাদের সাধ্যাতিরিক্ত কাজের চাপ দেননা এবং তাদের থেকে তাদের শক্তি সামর্থ্যের বাইরে কোন কাজও চাননা।

৩। ওয়াদা এবং ওয়ীদ - এর মানে, আল্লাহ্ নেক কাজের পুরস্কার ও বদ কাজের শাস্তি দেন এবং কেউ কবীরা গুনাহ্ করলে তওবা করা ছাড়া তাকে মাফ করেন না।

৪। কুফর ও ইসলামের মধ্যবর্তী স্থান নির্ণয়- মুতাযিলাদের গুরু ওয়াসিল ইবনে আতা এর ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন,

ঈমান হলো উত্তম স্বভাব চরিত্রের অপর নাম। যখন কারো মধ্যে এসব স্বভাব বিদ্যমান থাকে, তখন সে ঈমানদার। 'মুমিন' একটি গুণবাচক নাম। যেহেতু ফাসেকের মধ্যে এ উত্তম স্বভাবের সমাবেশ কখনো ঘটেনা, সেহেতু সে এ গুণের পদবাচ্য লাভের যোগ্য নয়। সুতরাং তাকে 'মুমিন' পদবাচ্যে অভিহিত করা যায়না। তবে সাধারণ ভাবে তাকে কাফেরও বলা যেতে পারেনা। কেননা,

সে কালেমা শাহাদাতে বিশ্বাসী এবং আরো অনেক [illegible] বিদ্যমান। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সে [illegible] তওবা করা ছাড়া মারা যায় তবে সে জাহান্নামে যাবে এবং [illegible] থাকবে। কেননা, আখিরাতে দল হবে মাত্র দু'টি। এক দল [illegible] দল যাবে জাহান্নামে। তবে এরূপ ব্যক্তির প্রতি কিছুটা অনুকম্পা [illegible] তার শাস্তি কিছুটা লঘু হবে এবং তাকে কাফেরদের এক দরজা উপরে [illegible] হবে।

৫। আমর বিল-মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার- ইসলামের [illegible] আবলীগের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ ও প্রতিরোধ [illegible] নিকট ওয়াজিব। অবস্থার আলোকে প্রয়োজনের খাতিরে ও যুগের নিরিখে [illegible] সকল উপায়ে তা করতেই হবে। কথা, বক্তৃতা ও লেখা কিংবা তেগ-তলোয়ার ও লড়াই সংগ্রাম দ্বারা যে ভাবেই হোক তা চালিয়ে যেতে হবে।

মুতাযিলাদের মতে, অত্যাচারী বা ফাসেক ইমাম বা উলিল আমর ও রাষ্ট্র প্রধানের পেছনে নামায পড়া জায়েয নয়। বিদ্রোহের ক্ষমতা থাকলে এবং বিদ্রোহ সফল করার সম্ভাবনা থাকলে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যায়-অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব।[১]

মুতাযিলাদের প্রধান অনুরাগ ছিল গ্রীক যুক্তিবাদের দ্বারা মুসলিম মানসে উদ্ভূত প্রশ্নাবলীর প্রতি। এগুলোর একটি হলো আল্লাহর নাম নিয়ে বিতর্ক। চিরাচরিত মতানুসারে আল্লার গুণবাচক নাম ৯৯টি। এরা সৃষ্টিকে স্রষ্টার এমন গুণাবলীর সাথে তুলনা করে এবং সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলী স্বীকার করে। সুতরাং পরোক্ষে এরা সৃষ্টিকেই তাদের ক্রিয়াকর্মের স্রষ্টা বলে অভিহিত করে।

মুতাযিলা যুক্তি বাদীদের মতানুযায়ী এসব মনুষ্য গুনাবলী সদৃশ নামের মর্যাদা অস্বস্তিকর। তদুপরি তারা বিশ্বাস করে যে, এগুলোর নাম যুক্তির নিক্তিতে কুরআন মজীদে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিঘোষিত আল্লার একত্ববাদের পরিপন্থী। ফলে তারা আল্লাহ তায়ালার নামকে খোদায়ী গুণাবলী হতে পৃথক মনে করে এবং আল্লার একত্ব রক্ষা করার জন্য বলে যে, আল্লার আত্ম বা সত্তা এবং তাঁর গুণাবলীর ধারণা পরস্পর বিরোধী নয়। তারা আরেকটি মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি

১। আল-মাশয়ারী – ২য় খন্ড, পৃঃ -১২৫

করেছে কুরআন মজীদকে কেন্দ্র করে। আহলে সুন্নাতের মত হলো পবিত্র কুরআন আল্লার অসৃষ্টি (غير مخلوق) বাণী এবং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু মুতাযিলারা এমতের বিরুদ্ধে। তারা ঘোষণা করে, কুরআনকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তা চিরঞ্জীব নয়।

কদরিয়া

কদরিয়া -"তাকদীর অস্বীকার করা।" এরা মানুষের তাকদীর অস্বীকার করে। এদের আকীদা হলো, মানুষ তার যাবতীয় ক্রিয়াকর্মে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী, তা অর্জন কারী এবং নিজ কর্মকান্ডের স্রষ্টা। এদেরকে কদরিয়া ফেরকা বলা হয়।

জবরিয়া

জবর মানে বাধ্যবাধকতা। এরা বান্দাদের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিতে বিশ্বাস করেনা এবং পবিত্র কুরআনের অদৃষ্টবাদীমূলক বাণীগুলোর অনুকরণ করে। তাই তাদের মতে মানুষ ইচ্ছা শক্তিরহিত ও কর্মশক্তিহীন নিছক জড় পদার্থতুল্য পাথরের মতো অসাড়। মানুষ না পারে কোন কর্ম সৃষ্টি করতে। না পারে তা অর্জন করতে। এরা মনে করে মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ, আল্লাহর ইচ্ছাধীন. এতে তাদের কোন হাত নেই। এদের মত কদরিয়াদের মতের বিপরীত। তাদের একদল সৃষ্টিকে স্রষ্টার উপর কিয়াস করেছে। অন্যদল কিয়াস করেছে স্রষ্টাকে সৃষ্টির উপর। একদল গুণাবলীতে, অন্যদল ক্রিয়াকর্মে। একদল তাকদীর অবিশ্বাসে সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি করেছে, অন্যদল তার বিপরীত করেছে।

জহমিয়া

জহম ইবনে সাফওয়ান নামে এক ব্যক্তি এমতের প্রতিষ্ঠাতা। সে আল্লার গুণাবলী অস্বীকার করে এবং আল্লাহকে জড়তুল্য নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত ও অসাড় মনে করে। তার মতে, জান্নাত ও জাহান্নাম একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে, আল্লার পরিচয় লাভের নামই হলো ঈমান। আর এব্যাপারে অজ্ঞতা হলো কুফরী।

মুরজিয়া

শীয়া ও খারেজীদের পরস্পর বিরোধী মতবাদের প্রতিক্রিয়ায় 'মুরজিয়া' মতবাদের প্রকাশ ঘটে। হযরত আলী (রাঃ) এর বিভিন্ন যুদ্ধের ব্যাপারে তার পূর্ণ সমর্থক, চরম বিরোধী এবং নিরপেক্ষ- এতিনটি দল ছিল। এরা গৃহযুদ্ধকে ফেতনা এবং অন্যায় মনে করতো। তবে কারা ন্যায় বা অন্যায়ের পথে সে

ব্যাপারে সন্দিগ্ধ। ছিল তারা কোন দলকে খারাপ বলতোনা, [illegible] ফয়সালার ভার আল্লার হাতে ছেড়ে দিত। শীয়া ও খারেজীদের [illegible] উঠলো এবং কুফরী ও ঈমানের প্রশ্ন তুলতে শুরু করলো, তখন মুরজিয়ারাও তাদের নিরপেক্ষতার পক্ষে আলাদা ধর্মীয় দর্শন দাঁড় করালো। [illegible] আলোচনা করা হলো ঃ

১। কেবল আল্লাহ্ ও রাসূলের পরিচিতির নামই ঈমান। আমল বা কাজ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইসলাম গ্রহণের কথা স্বীকার করলেই আমল যেরূপই হোক, কবীরা গুনাহ্ যা-ই করুক- সে ব্যক্তি একজন মুসলমান।

২। কেবল ঈমানের ওপরই নাজাত নির্ভরশীল। ঈমান থাকলে কোন গুনাহ্-ই ক্ষতি করেনা। শিরক থেকে বেঁচে তাওহীদের উপর মরতে পারাই নাজাতের জন্য যথেষ্ট।

কোন কোন মুরজিয়ার মতে, শিরক থেকে নিকৃষ্ট পাপেও ক্ষমা অনিবার্য। কেউ কেউ এতদূরও বলে, অন্তরে ঈমান পোষণ করে ইসলামী রাষ্ট্রে নিরাপদে থেকেও কেউ যদি মুখে কুফরী ঘোষণা বা মূর্তি পূজা কিংবা ইহুদীবাদ-খৃষ্টবাদ গ্রহণ করে, তবুও সে পূর্ণ ঈমানদার, আল্লার ওলী এবং জান্নাতি।

তাদের আরেকটি মত ছিল, আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার- ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায়ের নিষেধ- এর জন্য অস্ত্রধারণ প্রয়োজন হলেও তা ফিতনা। সরকারের যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা জায়েজ নয়। তবে অন্য লোকদের অন্যায়ে বাধাদান জায়েজ।

বস্তুতঃ মুরজিয়াদের মতে, মানুষের কার্যাবলীর ব্যাপারে ফয়সালা করার এখতিয়ার মানুষের নেই। এক্ষমতা তারা আল্লার উপর ছেড়ে দেয়ার পক্ষপাতি। তাই তাদের নাম মুরজিয়া।

মুশাব্বিহা

তাশবীহ থেকে এ শব্দ গঠিত। এর মানে সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা। আকীদা শাস্ত্রে স্রষ্টার সাথে কোন সৃষ্টির কিংবা কোন সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সাদৃশ্য প্রতিপাদন করাকে তাশবীহ বলে। যে সম্প্রদায় এরূপ করে বা এ মতে বিশ্বাস করে তাদেরকে মুশাব্বিহা বলে। যেমন, খৃষ্টানরা ঈসা আঃকে এবং ইহুদীরা ওযায়ের আঃকে আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য প্রতিপাদন করে থাকে। এরা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য কোন মানবীয় গুণ সাব্যস্ত করে, কোন মাখলুক বা সৃষ্টির [illegible]

গুণের সাথে স্রষ্টা আল্লাহকে সমতুল্য মনে করে বা তাঁর সাদৃশ্য স্বীকার করে। যেমন, তারা আল্লাহর জন্য মানুষের মতো দেহ, আকৃতি, হাড়, গোশত, পুত্র, কন্যা, প্রভৃতি আছে বলে স্বীকার করে। তারা সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টাকে তুলনা করে। এটা হলো তাশবীহ। আর কোন সৃষ্টিকে আল্লাহর গুণাবলীর কোন বিশেষ গুণের অংশীদার বা সমকক্ষ মনে করা হলো 'শিরক।' আল্লাহ্ তায়ালা সম্পর্কে এ উভয়রূপ আকীদাই তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অথচ কোন সৃষ্টিই যেমন কোন ক্ষেত্রেই আল্লাহর সাথে তুলনীয় নয়। তেমনি আল্লাহ্ও কোন রূপেই কোন সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন। এটিই তাওহীদের আসল অর্থ।

এদের যারা মনে করে আল্লাহ দেহ ও আকৃতি বিশিষ্ট এবং তিনি স্থান ও দিকের মুখাপেক্ষী, তাদেরকে মুজাসসিমা ফেরকা বলে।

এদের আরো দু'টি ফেরকা হলো ইত্তেহাদীয়া ও হুলুলিয়া ফেরকা। এ দু'ফেরকার আকীদা প্রায় এক ও অভিন্ন। তাদের মতে, সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যে প্রবেশ করে আল্লাহ সে গুলোর সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছেন। অতএব সব বস্তুই আল্লাহ্। এই আকীদাকেই আরবীতে 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ,' ও ফারসীতে 'হামাউস্ত' আর বাংলায় 'সর্বেশ্বরবাদ' বলা হয়। মুশাব্বিহারই আরেকটি উপদল মুনাব্বিরা। এরা আল্লাহর জাতকে নূর তথা আলো মনে করে। এটি কুফরী আকীদা। আল্লাহ্ তায়ালা নূর নন। তিনি নূরের স্রষ্টা। যেসব আয়াতে 'আল্লাহ্ আসমান যমীনের নূর' বলা হয়েছে, সেসব স্থানে 'নূর' মানে, আল্লাহ নূরের স্রষ্টা, বা আসমান যমীনের সবার হেদায়াতদানকারী কিংবা ঈমানদারদের অন্তরে হেদায়াতের আলো দান কারী। ইমাম নববী, ইবনে হাজার আসকালানী, আল্লামা আঈনী, আল্লামা আলূসী এসব মনীষী এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

মুয়াত্তিলা

এ শব্দটি এসেছে 'তা'তীল' থেকে। এদের আকীদা হলো, আল্লাহ্ তায়ালা রাসূল (সাঃ) এর নিকট যাবতীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করে এখন সম্পূর্ণ বেকার, স্থবির, নিষ্ক্রিয় ও ক্ষমতাহীন হয়ে আছেন। যেমন একদল দার্শনিক মনে করেন, যে দশটি জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা বিশ্বব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে, একে একে সে গুলো আল্লাহ্ থেকে নিক্রান্ত হয়ে গেছে। সুতরাং তিনি এখন সম্পূর্ণ বেকার, ক্ষমতাহীন ও স্থবির। নাউজুবিল্লাহ। এরা আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীর অর্থবাচকতা ও অর্থবোধকতা অস্বীকার করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচয়
اهل السنة والجماعة

কুরআন মজীদে সুন্নাহর অর্থঃ

১. পন্থা,পদ্ধতি এবং সীরাত ও চরিত্র, ২. আল্লাহর হুকুম, বিধান ও ফয়সালা, আদেশ ও নিষেধ, ৩. হিকমাত।

হাদীসে সুন্নাহর অর্থঃ ওহীয়ে গায়রে মাতলু' অর্থাৎ রাসূল সাঃ এর বাণী যা কুরআন নয়, শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস, রাসূলের সুন্নাহ যা কুরআনের তাফসীর বা ভাষ্য। রাসূল সাঃ এর কথা কাজ ও অনুমোদন।

রাসূল সাঃ বলেছেন-

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما-كتاب الله وسنة رسوله –

'তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস আমি রেখে যাচ্ছি, যতদিন এদু'টি তোমরা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে, ততদিন কখনও তোমরা গোমরাহ ও সত্যপথ বিচ্যুত হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। (ইমাম মালেক, মুয়াত্তা, কিতাবুল কদর, অধ্যায়-১, অনুরূপ হাদীস শাব্দিক কিছু রদবদল সহ আরও আছে।)

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাঃ কে ইয়েমেনে গবর্নর করে প্রেরণ কালে রাসূল সাঃ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন

ارايت إن عرض لك قضاء كيف تقضي ؟ قال اقضي بكتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله –

তোমার সামনে যদি কোন বিচার আসে, কিসের ভিত্তিতে ফয়সালা করবে?

তিনি বললেনঃ আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে আমি ফয়সালা করব। রাসূল সাঃ প্রশ্ন করলেনঃ তা হলে যদি তাতে বিষয়টি না থাকে? জবাব দিলেন: তাহলে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহর ভিত্তিতে। (দারেমী: পৃঃ-৬০)

রাসূল সাঃ বলেছেন ঃ

أن الامانة نزلت فى جذ رقلوب الرجال ثم علموا من القران ثم علموا من السنة - (البخارى -كتاب الفتن وصحيح مسلم فى كتاب الايمان-)

'আমানত মানুষের মনের মুকুরে নাযিল হয়েছে। অতঃপর তারা কুরআন থেকে তারপর সুন্নাহ থেকে তা জেনেছে।

আল্লাহ তায়ালার বাণী ويعلمهم الكتب والحكمة

এখানে কিতাব অর্থ কুরআন এবং হিকমাত অর্থ সুন্নাহ। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ, ইবনে মাসউদ রাঃ প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম 'সুন্নাহ' মানে কুরআনের বাইরে রাসূল সাঃ যা নিয়ে এসেছেন, তা বুঝিয়েছেন।

রাসূল সাঃ বলেছেন ঃ

وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا - فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشد ين المهد يين عضوا عليها بالنوا جذ - ابن ابى عاصم فى كتاب السنة - ٢٩/١ .. وابوداود فى باب لزوم السنة - والترمذى فى كتاب العلم- الباب (١٦) واحمد فى المسند -١٢٦/٤ والبيهقى فى الاعتقاد -)

তোমাদের যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক ইখতিলাফ ও মতভেদ দেখতে

পাবে। এ সময় আমার সুন্নাত এবং সঠিপথ প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত মেনে চলা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে। তোমরা দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরে ঐ সুন্নাহর উপর দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকবে।'

হযরত আবু বকর রাঃ বলেছেনঃ

السنة حبل الله المتين - الشرح الايانة - ١٦٠

'সুন্নাহ হল আল্লাহর মজবুত রশি।'

হযরত আবুযার রাঃ বলেছেন ঃ

امرنا رسول الله صـ .. ونُعَلِّمُ الناس السنن - سنن الدارمي -١/١٣٦

রাসূলুল্লাহ সাঃ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ..... আমরা যেন মানুষকে সুন্নাহ শিক্ষা দিই।

হযরত উমার রাঃ বলেছেন

إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القران فخذو بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله - سنن الدارمي -١ /٤٩

"অচিরেই এমন সব লোকের আবির্ভাব হবে, যারা কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর অর্থ নিয়ে তোমাদের সাথে বিতর্ক করবে। তখন তোমরা সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে। কেননা আহলে সুন্নাহ যারা তারাই আল্লাহর কিতাবে অধিক জ্ঞানী।"

সাঈদ ইবনে জোবাইর (মৃত্যু ৩৮৭হিঃ)

وعمل صالحا ثم اهتدى

এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন এর মানে

لزوم السنة والجماعة

অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে অপরিহার্য ভাবে ধরে থাকা। -

(الشرح والابانة على اصول السنة والديانة - لابن بطنة- ١٢٨ توفى ٣٨٧ هـ

ইমাম আওযায়ী (মৃত্যু-১৫৭ হিঃ) বলেছেন,

خمس كان عليها اصحاب النبي صـ لزوم الجماعة واتباع السنة .... (شرح السنة للبغوى- ٢٠٩/١

'সাহাবাগণ পাঁচটি জিনিসের উপর ছিলেন, আল-জামায়াত ধারণ করে থাকা এবং সুন্নাহর অনুসরণ।

ইমাম যোহরী রাঃ বলেন : আমাদের অতীতের আলেমগণ বলতেন সুন্নাহ আকড়ে থাকাতেই নাজাত। (দারেমীর সুনান-১/৪৫,আল্লামা ইবনে মুবারক আলযোহদ- ১/২৮১)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রঃ বলেছেন :

ان السنة هى الشريعة وهى ماشرعه الله ورسوله من الدين - .مجموع الفتاوى - ٤٣٦/٤

শরীয়াতই সুন্নাহ আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাঃ দীনের ব্যাপারে যা নির্ধারণ ও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা-ই হল শরীয়াত।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার রাঃ হযরত জাবির ইবনে যায়েদ রাঃ কে বলেছেন :

فلاتفت إلابقران ناطق اوسنة ماضية-سنن الدارمى -١٤٤/١

'তুমি একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতেই ফতোয়া দিবে।

হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (মৃত্যু-৯০ হিঃ) বলেছেন :

سفنى انك تفتى برأيك - فلا تفت برأيك إلا أن تكون سنة عن رسول الله صد اوكتاب منزل - سنن الدارمى - ٥٩/١

'কুরআন কিংবা রাসূলের সুন্নাহর ভিত্তিতেই রায় দিবে। তোমার নিজের মতে রায় দিবেনা।'

হাসসান ইবনে আতিয়া রাঃ (মৃত্যু-১২০ হিঃ) বলেছেন :

كان جبريل ينزل على رسول الله صد بالسنة كما ينزل بالقران- (مجموع الفتاوى لا بن تيمية - ٣٦٦/٣

জিবরাইল আঃ সুন্নাহ নিয়েও আল্লাহর রাসূলের উপর নাযিল হন, যেমন নাযিল হন কুরআন নিয়ে।'

শরীয়তের যেসব বিধান ফরয নয় নফল বা মুস্তাহাব, সে সবকেও সুন্নাত বলা হয়। রাসূল সাঃ বলেছেন

فإن الله عزوجل فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه - (احمد فى المسند - ١٩١/١

'আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের উপর মাহে রমযানের রোযা ফরয করেছেন। আর আমি রমযানের রাত্রে তোমাদের জন্য কিয়াম (অর্থাৎ তারাবীহর নামায) কে সুন্নাত করেছি।'

উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হয়েছে যে, সুন্নাহ্ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। কুরআনের বাইরে রাসূল সাঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন, তাঁর কথা, কাজ, অনুমোদন, নীতি, পদ্ধতি, হেদায়েত, সীরাত ও চরিত্র, দীন, শরীয়াত, খুলাফায়ে রাশেদীনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড, দীনের মৌলিক নীতিমালা এর শাখা প্রশাখা, সাহাবায়ে কিরামের ইজমা, ইলম ও কর্ম সংক্রান্ত তাদের যাবতীয় বর্ণনা, আকীদা, হুকুম আহকাম, ফযীলত ও চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর স

বলেছেন, কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে সত্যপন্থী নেতৃবর্গ, ইমাম, ফকীহ, মুজতাহিদগণ, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণ যেসব সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, এবং ইজমায়ে উম্মাহ- এসব কিছু যারা অনুসরণ করে এবং মেনে চলে তাদেরকে আহলে সুন্নাহ বলে।

আল জামায়াত

শরীয়তের দৃষ্টিতে আল-জামায়াত বলতে বোঝায় ঃ

১। রাসূল সাঃ-এর আমলের, সাহাবায়ে কিরামের যুগের বিশেষভাবে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের সর্বসাধারণ সাহাবায়ে কিরামের দলই হল আল-জামায়াত। নেতৃত্ব, আইন-কানুন, জিহাদ এবং দীন-ও দুনিয়ার সব বিষয়ে তাঁরা হক ও সত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। তাঁরাই দীনকে সঠিক ভাবে ধারণ করেছেন, প্রচার করেছেন, নবীর আদর্শকে বহন করেছেন। রাসূল সাঃ তাঁদের প্রতি ইন্তেকাল পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করেছেন। তাঁরা কোন গোমরাহী বা ভ্রান্তির উপর ঐক্যবদ্ধ হননি।

আল্লামা শাতেবী রঃ তাঁদের শানে বলেছেন ঃ 'বিশেষভাবে সাহাবায়ে কিরামের দলকেই আল-জামায়াত বলা হয়। কেননা, তাঁরাই দীনের ভিত্তি কায়েম করেছেন, এর খুঁটি সুদৃঢ় সুসংহত ও করেছেন। তাঁরা কখনও মূলত কোন গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ হননি। এমনটি অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়। (আল-ইতেসাম ২-২৬২)

এর পরে হলেন তাবেয়ীন অর্থাৎ নীতি আদর্শ, পন্থা পদ্ধতি সর্ব ক্ষেত্রে যাঁরা সাহাবায়ে কিরামকে অনুসরণ করেছেন তাঁরাও আল-জামায়াতের উপর অটল ছিলেন।

অতঃপর যাঁরা তাবেয়ীনদের নীতি অনুসরণ করে চলেছেন, সেই তাবে তাবেয়ীনগণও আল-জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা আল-জামায়াত ও সুন্নাহর সঠিক অনুসারী ছিলেন।

এভাবে যেসব বিজ্ঞ আলেম, ফকীহ, ইমাম, মুজতাহিদ, আল-জামায়াত ও

সুন্নাহর পথে চলেছেন। তাঁরাও আল-জামায়াতের অনুসারী ছিলেন। সুতরাং যারা নবী করীম সাঃ ও সাহাবায়ে কিরামের সেই নীতি, আদর্শ ও পথ অনুসরণ করেছেন এবং বর্তমানে করছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত করবেন, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী এবং নাজাত প্রাপ্ত দল হিসেবে পরিগণিত হবেন।

হযরত উমর রাঃ বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাঃ বলেছেন : عليكم بالجماعة اياكم والفرقة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد ومن اراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة ـ احمد فى المسند ٢٧٨/٤، ٣٧٥.........وابن ابى عاصم فى السنة - ٤٤/١

আল-জামায়াতের মধ্যে শামিল থাকা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। একাকী ও থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পরিহার করা অপরিহার্য। কেননা একজনের সাথে থাকে শয়তান। দু'জন থেকে সে দূরে সরে যায়। যে ব্যক্তি জান্নাতে যেতে চায় আল-জামায়াতের অর্ন্তভূক্ত হওয়া তার কর্তব্য।

রাসূল সাঃ বলেছেন :

يد الله على الجماعة - ابن ابى عاصم فى السنن-١/ ٤٠

'আল্লাহর রহমতের হাত আল-জামায়াতের উপর।'

يد الله مع الجماعة - (الترمذى -كتاب الفتن

আল্লাহর রহমতের হাত আল-জামায়াতের সাথেই রয়েছে।

فانه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية -(صحيح البخارى - كتاب الفتن ق- فتح

البارى

আল-জামায়াত থেকে এক বিঘত পরিমান বিচ্ছিন্ন হয়ে যে মারা গেল, তার জাহেলী মৃত্যুই হল।

সুতরাং নবী করীম সাঃ ও সাহাবায়ে কিরাম যে নীতি ও আদর্শের উপর ছিলেন, যারা সে নীতি ও আদর্শের উপর থাকবে, তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং অনুসরণ করে চলবে। তাঁরা যে হকের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিলেন,তার উপর ঐক্যবদ্ধ থাকবে। দ্বীনের ব্যাপারে ভেদাভেদে লিপ্ত হবে না। হকপন্থী নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকবে,তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না এবং সালাফে সালেহীনের 'ইজমা' মেনে চলবে, তাদেরকেই 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত নামে অভিহিত করা হবে।

ইসলামে আক্বীদার গুরুত্ব

'আক্বীদা'-শাব্দিক অর্থ কোন বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করা, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা এবং একনিষ্ঠভাবে সত্যতা স্বীকার করা।

পরিভাষিক অর্থ, এমন দৃঢ় ও মজবুত ঈমান, যাতে সন্দেহ-সংসয় প্রবেশের বিন্দুমাত্র পথও ঈমানদারের নিকট না থাকা।

ইসলামে আক্বীদা মানে, আল্লাহ তায়ালার প্রতি, তাঁর একত্ব, এককত্ব ও আনুগত্য সংক্রান্ত জরুরী ও অপরিহার্য বিষয় গুলোর প্রতি, তাঁর ফেরেশতা কুল, কিতাবসমূহ, নবী রাসূলগণ, আখিরাত, তাকদীর এবং যাবতীয় দলীল প্রমাণসহ বর্ণিত গায়েবী বিষয়াবলী, খবরাখবরও অকাট্য প্রমাণ ভিত্তিক ব্যাপারগুলোর প্রতি দৃঢ় ঈমান পোষণ করা। চাই তা ইলম ও জ্ঞান সংক্রান্ত কিছু হোক কিংবা হোক আমল ও কর্মকান্ড সংক্রান্ত কোন কিছু।

মূলত মুসলমানদের নিকট তাঁদের ঈমান আক্বীদার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। যাবতীয় আমল ও কর্মকান্ড আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া সম্পূর্ণরূপে আক্বীদা সঠিক হওয়ার উপরই নির্ভরশীল।